দুই: প্রাচীন বাংলার নাট্য চেতনা ।।

বাঙালীর নাট্যচিন্তার ক্রমবিকাশকে কালানুক্রমিক ভাবে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে । প্রাক্-আর্য যুগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালটিকে আদিযুগ, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে মধ্যযুগ এবং মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এই সময় সীমাকে আধুনিক যুগ বলা যেতে পারে । অবশ্য এই বিভাগগুলির মধ্যেও কয়েকটি উপবিভাগের আবশ্যকতা আছে । এই উপবিভাগগুলিরও নিজস্ব চারিত্র্য আছে, যথাস্থানে তা আমরা দেখবো ।

বাঙালীর নাট্যচেতনার আদিযুগের ইতিহাস আলোকময় নয় । আলো-অন্ধকার যুগের ধূপছায়া কাটিয়ে এই সময়ের নাট্যচিন্তা ও নাট্য-চেতনার ইতিহাস রচনাও সহজ-সাধ্য নয় । ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ উপাদানের অভাব অত্যন্ত প্রকট । পরোক্ষ উপাদান যথাসাধ্য যা-কিছু পাওয়া যায়, সেই স্বল্প উপাদান সম্বল করেই এই পর্বে বাঙালীর নাট্যচিন্তার স্বরূপ সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হবে । এই উপাদান-স্বল্পতা যে শুধু নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়, এই স্বল্পতা এই পর্বের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

নাটক জাতীয় জীবনের দর্পণ । একটি জাতির বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি-সংস্কার সেই যুগের নাট্যচেতনায় প্রতিবিম্বিত হয় । বাঙালীর নাট্যচেতনার মূলেও এই বৈশিষ্ট্যটি কতখানি বিদ্যমান তা বুঝে নিতে হলে, বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন । বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলার ভাব-সত্তায় এই ব্যাপারটিতে কিভাবে

বৈদিক ও অবৈদিক, আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্য দিয়ে একটি বঙ্গীয় আর্যসংস্কৃতির উদ্ভব হল তার ইতিহাস জানা আবশ্যক। মূল-প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে গুপ্তযুগ থেকেই উত্তর-ভারতীয় বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিজয়াভিযানের সূত্রপাত। এই সময় থেকে সেন-বর্মণ যুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী বিভিন্ন রাজাগণ উত্তর ভারত থেকে বৈদিক-ব্রাহ্মণদের আনিয়ে এদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসারে যত্নবান হয়েছিলেন। বাংলাদেশে বৈদিক স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ধারক ও বাহক হয়েছিলেন এই নবাগত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজদত্ত ভূমি ও বাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এঁরা আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি চর্চায় ও প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। মূলত: এঁদেরই সক্রিয় প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের একটা ধারা গড়ে উঠেছিল। আসলে এই পর্বটি ছিল বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এক অভিনব রূপান্তর সংঘটনের কাল। বাঙালী সংস্কৃতি বলতে আজ আমরা যা বুঝি তার বৃহত্তর অংশই উত্তর-ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। আর্য-সংস্কৃতির বহুমুখী প্রভাবের চাপে বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নানাভাবে বিপর্যস্ত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর একদিনে হয় নি, অনেকদিন ধরে চলেছিল এর প্রক্রিয়া। এই ভাবে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী নাগাদ বাঙালীর আর্যী-করণ একরূপ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

খ্রীস্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারে আসবার অনেক আগে থেকেই উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে

মনে হয়। মেগাস্থিনিসের ভারত বৃত্তান্ত ছাড়াও খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলাদেশে উৎপন্ন রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে।[১] পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ীতে পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও গৌড়ের উল্লেখ আছে।[২] জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গসুত্তে' সুব্ভভূমি ও বজ্জভূমির (সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমি) বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর এদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। রাঢ় অঞ্চলে মহাবীর ভাল ব্যবহার না পেলেও এদেশে একসময় জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। জৈন ধর্মই বাংলার আদিমতম আর্যধর্ম। বাংলাদেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে গুপ্তযুগের আগেই জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। বাংলাদেশ একসময় আজীবিকদের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু গুপ্তযুগের পর থেকেই সম্ভবতঃ বাংলাদেশে জৈনধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।

প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পাশাপাশি সমতালে প্রবাহিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাটিও উল্লেখযোগ্য। এই ধারার সূত্রপাত হয়েছিল অশোকের সময় থেকে। বাংলাদেশে তুর্কি অভিযানের আগে পর্যন্ত বৌদ্ধ-সংস্কৃতির এই ধারা বহমান ছিল।বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে বৌদ্ধ বিহার ও মহাবিহারগুলির অস্তিত্ব এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তিরই নিদর্শন।

স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মমতগুলি মূলতঃ আর্যধর্মই। এই সমস্ত ধর্মমত ও সংস্কার বাঙালী সমাজের উপরিস্তরকে যতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছিল, বাংলাদেশের লোকায়ত জীবনকে ঠিক ততখানি প্রভাবিত হোক-

হৃষ্ট করতে পারে নি। সাধারণ মানুষ বৈদিক-স্মার্ত নিয়মকানুন ও সংস্কারের মধ্যে তাদের ধর্মবোধের মুক্তির সন্ধান যদি না পেয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। বহিরাগত বৈদিক-স্মার্ত দর্শন ও সংস্কারের চাইতে লোকায়ত জীবনকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কার। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে এই লোকায়ত ধর্মের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ বিষ্ণুচক্র এই ধারার প্রথম নিদর্শন। এর পরে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন সময়ে বিষ্ণুমূর্তি, মন্দির ও পূজা-পার্বণের কিছু কিছু নিদর্শন ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গুপ্তযুগ থেকেই বৈষ্ণব-ধর্মের অনুষঙ্গী কৃষ্ণ ও রামকথা-কাহিনী বাংলাদেশে প্রচারিত হতে থাকে। বিভিন্ন স্থানের মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির যে সব ফলক পাওয়া গিয়েছে, তাতে রাম-কৃষ্ণ বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই সূত্র ধরে হয়ত দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ বাংলাদেশে রাধা-কৃষ্ণলীলার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এবং এই বাংলাদেশেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন এক সময় শাক্ত ধর্মের শক্তিতত্ত্বের আদর্শে রাধাতত্ত্ব ও রাধার রূপ-কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। [৩] বাংলাদেশে উদ্ভূত এই রাধাই পূর্ণবিকশিত রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'।

বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি শৈবধর্মের আর একটি ধারাও বাংলাদেশে সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। অবশ্য প্রাচীন বাংলার এই শৈবধর্ম পুরোপুরি পৌরাণিক আদর্শের অনুরূপ। গুপ্তযুগে বৈন্য-গুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় শৈবধর্ম যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। রাজা শশাঙ্কও ছিলেন শৈব। পাল বংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও শৈবধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল। এর পরেও বিভিন্ন রাজা ও রাজন্যবর্গের দ্বারা শৈবধর্মের

প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলেই মনে হয়।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে উত্তর ভারতীয় পৌরাণধর্ম বাংলাদেশে কিছুটা প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত নানা শ্রেণীর মূর্তির সাক্ষ্যে একথাই মনে হয় যে, বাংলাদেশে একসময় একটি বিশিষ্ট শৈব সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন বাংলার এই পর্বে নানা ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল বলে জানা যায় না। বরং য়ুয়ান-চোয়াঙ বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থ উপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সকলকেই একসাথে মিলেমিশে থাকতে দেখেছেন। একদিকে যেমন কোন কোন রাজা কখনও কখনও বিরুদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরাগ দেখিয়েছেন বা তাদের উৎখাত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অপরপক্ষে এই বাংলা দেশেই এমন উদাহরণেরও অভাব নেই যে, এক ধর্মাবলম্বী রাজা অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করেছেন। কখনও কখনও তাঁরা বৈদিক ধর্মচর্চার পীঠস্থানগুলিকে ভূসম্পত্তি ইত্যাদি দান করে তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা করেছেন। বাঙালী সমাজের এই পর্বে এমন ঘটনারও অভাব ছিল না যেখানে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শৈব মতাবলম্বী, কেউ বা বুদ্ধের উপাসক। কোথাও রাজা ছিলেন বৌদ্ধ, রাণী ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিতা। এঅবস্থায় সমাজ জীবনে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বা মতবিরোধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন স্পষ্ট ধর্মবিভাগ কল্পনাও বোধ হয় সম্ভব নয়। এই সময়ে প্রচলিত ধর্মমতগুলিকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা

হতে পারে - ১) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্য-বাহিত গ্রামদেবদেবী পূজা (যার মধ্যে বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা, প্রাক্-আর্য দেবতা, নতুন পরিগৃহীত দেবতারাও আছেন) ২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশিষ্ট ও স্থানীয় রূপ, ৩) যোগী-তন্ত্র (যার মধ্যে শৈবমতের প্রভাব আছে) এবং ৪) পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত (যার মধ্যে প্রধান - বিষ্ণু-চণ্ডী-শিব উপাসনা)।[৪] পালও, সেন ও বর্মন রাজাদের ব্যক্তিগত বিরোধিতা সত্ত্বেও জনসাধারণের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থানের মানসিকতার কারণেই সম্ভবতঃ এই বাংলাদেশের মাটিতে বৌদ্ধধর্ম মধ্যযুগের শেষসীমা পর্যন্ত বহাল-তবিয়তে বজায় ছিল। অবশ্য একথাও ঠিক যে, সেন-বর্মন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত ও আনুকূল্য ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রসারকে সংকুচিত করে তুলেছিল।

বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি আর্য ধর্মমতের প্রভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত বাংলাদেশের আদিম অস্ট্রো-দ্রাবিড় সংস্কার এক অভিনব রূপান্তর গ্রহণ করল। প্রায় হাজার দেড়েক বছরের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ তার পুরণো সংস্কৃতির খোলস পাল্টে আর্যাবর্তের আর্য সংস্কারের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠল। অবশ্য এই সংস্কার ও রূপান্তরের ঢেউ মধ্যবর্ণ হিন্দু সমাজের প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়েছে এবং তাদের মানসিকতাকে প্লাবিত করেছে, কিন্তু ততটা পরিমাণে বোধ হয় বাংলাদেশের নিম্নস্তরের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

আর্য (নবীন) ও প্রাগার্য (আদিম) সংস্কৃতির একটা বিপরীতমুখী ধারা সম্ভবতঃ আর্যাভিযানের কাল থেকেই এদেশে বহমান ছিল। নবাগত আর্যগণ ছিলেন বৈদিক-স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সংস্কারবশী, চিন্তাশীল, যজ্ঞপরায়ণ।

অপরপক্ষে দেশীয় আদিবাসীরা ছিলেন লোকায়ত সংস্কার ও দৈববাদী , ব্রত - পরায়ণ , ভাববিলাসী , লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনাকারী , নৃত্যগীতাদির অনুরাগী । পূর্বযুগ থেকেই নবাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কারপন্থী আর্যদের জ্ঞানচর্চার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা । অন্যপক্ষে লোকজীবনের ব্যবহারিক ভাষা ছিল প্রাকৃত । আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই বিপরীতমুখী ধারাটি মধ্যযুগের প্রাক্কালেও যে একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নি , তার নানা প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সমকালীন ধর্মভাবনায় । বঙ্গজীবনের সমকালীন ভাবধারার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন ,-

> "দুই স্তরের দেবতা যখন এক হইয়া আসিয়াছে তখন সেই দেবতাদিগে নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট ভাবধারা দুইটি পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে । শিব যখন শাস্ত্রপন্থী নবীনের দেবতা তখন তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ সতীপতি উমাধব , আর যখন তিনি ভাববিলাসী প্রবীণের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ , গঞ্জিকাধুস্তুরসেবী, নীচ শবরনারীর লোভে হীনকর্মে রত । কৃষ্ণ যখন প্রথম স্তরের দেবতা তখন তিনি পূতনাবিনাশী গোবর্ধনধারী কংসাসুরমর্দন মহাভারত নাটক সূত্রধার গোবিন্দ , আর যখন দ্বিতীয় স্তরের দেবতা তখন তিনি গোপীকেলিকারি দুর্বিনীত গোপাল । চণ্ডী যখন প্রথম স্তরের দেবতা , তখন তিনি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী মহিষাসুর মর্দিনী , আর যখন তিনি দ্বিতীয় স্তরের দেবতা তখন তিনি বনপশুপালিনী , মুখরা শিবপত্নী । দ্বিতীয় স্তরের কোন কোন দেবতা কখনই প্রথমস্তরে প্রমোশন পান নাই । যেমন ইন্দ্র, ধর্ম, মনসা ।"[৫]

ডঃ সেনের উপরুক্ত মন্তব্যটির আংশিক সত্যতা স্বীকার করেও বলতে হয়, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য থাকলেও এই পার্থক্যটি মধ্যযুগে অনেকটাই অস্পষ্ট হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য উন্নাসিকতা আর অব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে অপাংক্তেয় বলে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি। প্রয়োজনের তাগিদেই লৌকায়ত অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমুদয় মোড়কে আবৃত করে নিজেরাও তাকে গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই প্রায় মধ্যযুগের মাঝামাঝিতে এসে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও লৌকায়ত সংস্কৃতির মিলন মিশ্রণজাত বিশিষ্ট বাঙালী সংস্কৃতিটি গড়ে উঠেছিল।

বাঙালীর ইতিহাসের ঊষালগ্নে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযানের আগে এদেশ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় (এদের মধ্যে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর লোকই বেশী) এবং অল্প সংখ্যক অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এই জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা কোমে বিভক্ত ছিল। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব আচার-সংস্কার, উৎসবাদি, জীবনযাপনের নানাবিধ রীতি-নীতি ছিল। উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এদেশের বিভিন্ন কোমে বিভক্ত প্রচলিত সংস্কৃতি সমূহের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। উত্তরভারতীয় আর্যরা এই অনার্য সংস্কৃতিকে কোনদিনই সুনজরে দেখেনি। এদেশের মানুষকে তারা অসুর, ম্লেচ্ছ, পাপ, দস্যু প্রভৃতি নানা কটূক্তিপূর্ণ বিশেষণে আখ্যাত করেছে। এদের দুর্বোধ্য কথা-বার্তাকেও তারা বলেছে - 'বয়াংসি'। আর্যদের দৃষ্টিতে এই অঞ্চলের লোকেরা ছিল ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত। কিন্তু এই অবজ্ঞা ও ঘৃণা চিরস্থায়ী হয় নি। নানাকারণেই

এদেশে আর্যদের যাতায়াত শুরু হয়। সেটা যে অনেককাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ ও কৌটিল্য-পাণিনির গ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক-কালে কিছু কিছু খননকার্য থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ও পাথরের দ্রব্যাদি থেকে এমন একটা অনুমান করা যায় যে, আর্য-পূর্ব বাংলাদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মানুষের যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের কারণ সম্ভবতঃ ছিল বাণিজ্যিক। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এই বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল-এই তথ্য ইতিহাসস্বীকৃত। আর্যাভিযানের পূর্বেও এদেশে একটি উন্নত সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারা ছিল। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছি ছিল। কিন্তু সেই ঐতিহ্যের কোন চিহ্নই মহাকালের পথ অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় নি। তাঁদের ভাষা-ভঙ্গী, লিপি প্রভৃতি যে কি বা কেমন ছিল তাও আমরা জানি না। সর্বগ্রাসী আর্য-সংস্কৃতির করাল গ্রাসে সেই আদিম সংস্কৃতির অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে তা একদিনে হয় নি, দীর্ঘ দেড়হাজার বছরের টানা-পোড়েন ও বিরোধ-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ বাংলা দেশে আর্য-সংস্কার মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

তথাপি, আর্যসংস্কার যে বাঙালী সংস্কৃতিকে আমূল গ্রাস করতে পেরেছিল তা মনে হয় না। সুদীর্ঘ দেড়হাজার বছরের প্রচেষ্টার পরেও প্রাগার্য সংস্কৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রূপান্তরিত বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। বাঙালীর উৎসবাদি, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিতে এখনও প্রাগার্য-আদিম সংস্কৃতির চিহ্নগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। বাঙালী মেয়েদের বিভিন্ন ব্রতোৎসবে, বিবাহ সংস্কারে, পৌষপার্বণ-নবান্ন প্রভৃতি

অনুষ্ঠানে, ঘটলক্ষ্মী ষষ্ঠী মনসা চণ্ডী শীতলা শ্মশানকালী চড়ক পূজা প্রভৃতি লৌকিক ও অর্ধ-পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পাশাপাশি বৈদিক, স্মার্ত ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুশীলন প্রাগার্য ও আর্য-সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণজাত এক অভিনব বাঙালী সংস্কৃতিরই নিদর্শন।" বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যাহা কিছু শিল্প-সুষমাময় তাহার অনেকখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত।"[৬]

প্রাগার্য বাংলা দেশের লিপি-লেখনের কিছুই পাওয়া যায় নি। তাঁদের লিপি কি ছিল, ভাষাই বা কি ছিল - আমরা কিছুই জানি না। তবে তাঁরা যে নিরক্ষর ছিলেন না, তা সহজেই অনুমান করতে পারি। বাঙালীদের সঙ্গে উত্তর ভারতের বিশেষ করে মগধের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তার উল্লেখ আমরা পেয়েছি। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌড়দের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়, এদেশে লেখাপড়ারও ভালই প্রচলন ছিল। কিন্তু তখনকার কোন কিছুই আমরা পাই নি। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরণো লিপি যা পাওয়া গিয়েছে সেটি অশোকের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রীস্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা একটি শিলাখণ্ড-লিপি। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় থেকে এটি পাওয়া গিয়েছে। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগে যে এদেশে সংস্কৃত ভাষার কোন ব্যবহার ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত পরবর্তী শিলালিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহাগাত্রে। এর ভাষা সংস্কৃত। সমুদ্রগুপ্তের আমলের উৎকীর্ণ লিপি ছিল এটি। এথেকে মনে হয়, মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত প্রাকৃতই কি দৈনন্দিন জীবনে, কি রাজকার্যে

একমাত্র ব্যবহারিক ভাষা ছিল । গুপ্ত যুগ থেকেই শিষ্ট সমাজে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার হ্রাস পেতে থাকে । এই সময় থেকে যে সব লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়, সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা । রাজকার্যে, শিক্ষিত সমাজে, শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষাই একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে । প্রাকৃত ভাষা যে একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা অবশ্য মনে করবার কোন কারণ নেই । সংস্কৃত চিরকালই ছিল ভদ্র-শিষ্ট সমাজের ভাষা । মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের বাইরে যে বৃহত্তর অশিক্ষিত জনসমাজ ছিল তাদের ভাববিনিময়ের ভাষা ছিল প্রাকৃত । সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজ সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ, স্মৃতি, কাব্য-সাহিত্য রচনা করেছেন প্রচুর । খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে এদেশে সংস্কৃত চর্চার একটা বিশিষ্ট রীতিও গড়ে উঠেছিল । ধ্বনি গৌরবময় এই বাণীভঙ্গীকেই আলংকারিকগণ বলেছেন গৌড়ীরীতি । সংস্কৃত ভাষাচর্চা শুধু হিন্দু-পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদায়ও এই সংস্কৃত ভাষাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন । সংস্কৃত ভাষার এই আধিপত্যের যুগে প্রাকৃত ভাষার চর্চা ছিল অতি সীমিত । তবে অষ্টম শতাব্দী থেকেই প্রাকৃতের বিবর্তিত রূপ অপভ্রংশজাত অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকে । এই ভাষায় জৈনদের লেখা কিছু বই পাওয়া গিয়েছে । বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী এবং শৈব নাথ-পন্থীদেরও কিছু লেখা পাওয়া যায় এই ভাষায় । নীতিবাক্য, প্রবাদ-প্রবচন, বিবিধ বিষয়ক ছড়াও অবহট্‌ঠে লিখিত হয়েছিল । অবহট্‌ঠে লেখা 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' বেশ কিছু বাঙালী কবির রচনা স্থান পেয়েছে । পূর্বী মাগধীই বিবর্তিতরূপে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মধ্য দিয়ে খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী নাগাদ আধুনিক বাংলায়

ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছিল, যার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ' চর্যাপদে' । নবীন বাংলায় বিকাশোন্মুখ অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন চর্চার মধ্য দিয়ে মহাকালের অনিবার্য আকর্ষণে ধীরে ধীরে ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু রাজানুকূল্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চাও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি । খ্রীস্টীয় দ্বাদশ - ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন রাজা ও সামন্ত-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের ধর্ম-দর্শন-কাব্য-সাহিত্যচর্চার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । তবে একথা ঠিক যে, এদেশে যে পরিমাণে সংস্কৃতচর্চা হয়েছে ঠিক সে পরিমাণে সাহিত্য পদবাচ্য রচনার সৃষ্টি হয় নি। রাজপ্রশস্তিমূলক খণ্ড কবিতা লেখা হয়েছে প্রচুর । কাব্যের সংখ্যা সেই তুলনায় মুষ্টিমেয় । দু' একটি নাটক এবং কিছু প্রকীর্ণ কবিতা - কাব্যসাহিত্যের এই যা কিছু সম্বল । এগুলির মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় রচিত একমাত্র গীত গোবিন্দ ছাড়া আর কোন রচনাই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি ।

বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় কিছু কাব্য-কবিতা লেখা হলেও নাটক লেখা হয়েছে দু' একটি মাত্র । সংস্কৃত যে ক'টি নাটককে বাঙালীর রচিত বলে মনে করা হয়, সেগুলির মধ্যে ক'টি যে যথার্থ বাঙালী লেখকের রচনা তা নিয়ে পণ্ডিতমহলের যথেষ্ট সংশয় আছে । বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'; মুরারির 'অনর্ঘরাঘব', ভট্টনারায়ণের ' বেণীসংহার', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' ও 'নৈষধানন্দ' - এই নাটকগুলির সব ক'টিই যথার্থ বাঙালীর রচিত কিনা তার কোন গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি । এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য 'মুদ্রারাক্ষস' । সমগ্র সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসেই 'মুদ্রারাক্ষসের

একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রোমান্টিক প্রণয়াত্মক সংস্কৃত নাটকের রাজ্যে একমাত্র মুদ্রারাক্ষস'ই বস্তুগতের নাটক। দশ অঙ্কে বিশিষ্ট এই নাটকের বিষয়বস্তু চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এই নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র ঐতিহাসিক - রাজনৈতিক নাটক। এই নাটকের রচয়িতা বিশাখদত্তের পরিচয় রহস্যাবৃত। তিনি নিজের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। বিশাখদত্ত মহারাজ পৃথুর (নামান্তরে ভাস্কর দত্ত) পুত্র, সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র। এঁরা যে প্রকৃত পক্ষে কোন অঞ্চলের লোক ছিলেন তা নিশ্চয় করে কিছুই জানা যায় না। অনেকেই অনেকরকম অনুমান করেছেন; উইলসন মনে করেন, পৃথুরায় ছিলেন আজমীরের চৌহান সর্দার। বিশাখদত্ত কবে 'মুদ্রারাক্ষস' রচনা করেছেন তারও কোন উল্লেখ তিনি করেন নি। নাটকের ভরতবাক্যের শেষে 'চন্দ্রগুপ্ত' এই শব্দটি পাওয়া যায় -

"ম্লেচ্ছৈরুদ্বেজ্যমানা ভুজযুগমধুনা সংশ্রিতা রাজমূর্তেঃ।
স শ্রীমদ্বন্ধুভৃত্যশ্চিরমবতু মহীং পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ॥"

'চন্দ্রগুপ্ত (যেমনি) রাজমূর্তি ধারণ করে, তাঁর মহাবাহু প্রসারণ করে বন্ধু ও ভৃত্যের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ম্লেচ্ছের উৎপাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করুন।' - নাটকের শেষে চাণক্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষস এই উক্তিটি করেছিলেন। এই ভরতবাক্যটির পাঠান্তর ও পাওয়া যায়, চন্দ্রগুপ্তের স্থানে অবন্তীবর্মা, রন্তিবর্মা, দন্তিবর্মা - এভাবে। এই নামগুলির সূত্র ধরে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন কালের কল্পনা করেছেন। কিন্তু এই ভরত বাক্যটির দ্বারা 'মুদ্রারাক্ষসের' রচনাকাল নির্ধারণের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। পাঠান্তরগুলির কথা ছেড়ে দিলেও 'চন্দ্রগুপ্ত'

নামটিও কম বিভ্রান্তিকর নয় । ইনি কোন চন্দ্রগুপ্ত , চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য , অথবা বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেও এমন একটি রাজনীতি সচেতন নাটক রচনায় সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায় না । যদি তা হত , তাহলে পরবর্তী সংস্কৃত নাটকের উপর অন্ততঃ এই নাটকের কিছুটা প্রভাব পড়তই । আবার এই ভরতবাক্যের 'ম্লেচ্ছ' শব্দটির সূত্র ধরে অনেকে কাল নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন । উইলসন-এর অনুমান , এই ম্লেচ্ছরা আসলে পাঠানরাজগণ । এই সূত্র ধরে তিনি নাটকটির রচনাকাল নির্ধারণ করেছেন একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী । আবার পণ্ডিত কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলং এর কাল খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলে মনে করেছেন । সুতরাং এই নাটকটির কোন সুনির্দিষ্ট রচনা কালেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি । তবে নাটকটি যে সংস্কৃত সাহিত্যের বৈভবকালে রচিত নয় , তা নানা কারণেই অনুমান করা যায় । কিন্তু নাটকটি যে বাংলাদেশে রচিত হয়েছে বা বিশাখদত্ত বঙ্গদেশবাসী ছিলেন এমন কোন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় নি । বিশাখদত্ত বাঙালী ছিলেন , এমন তথ্য যদি কোথাও কখনও আবিষ্কৃত হয় , তাহলে বাঙালীর পক্ষে গৌরবের কারণ হবে ।

ষড় রস বিশিষ্ট 'বেণীসংহার' নাটকের রচয়িতা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বাঙালী ছিলেন বলে অনুমান করা হয় । আদিশূরের আমন্ত্রণে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসেছিলেন , ভট্টনারায়ণ তাঁদের অন্যতম । আদিশূর প্রসঙ্গে কিংবদন্তীর বাহুল্য , তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই অনেক বিতর্ক আছে । সুতরাং ভট্টনারায়ণ আদৌ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন কিনা , বা থাকলেও তাঁর জীবৎকাল কি তা স্থির রূপে নিরূপিত হয় নি । তবে বামনের 'কাব্যালংকারে' এবং আনন্দ-বর্দ্ধনের 'ধ্বন্যালোকে' 'বেণীসংহারের' শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় তাঁকে অষ্টম শতাব্দীর

পূর্ববর্তী বলেই ধরে নেওয়া যায়। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত ভট্টনারায়ণকেই একমাত্র বঙ্গদেশবাসী সংস্কৃত নাট্যকার বলে সবাই মেনে নিয়েছেন। মহাভারতের সভাপর্বে দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে ক্রুদ্ধ ভীমের দুঃশাসনের রক্তা-লিপ্ত হস্তদ্বারা দ্রৌপদীর বেণীবন্ধনের প্রতিজ্ঞা – 'বেণীসংহারের' প্রতিপাদ্য। নাটক হিসেবে 'বেণীসংহার' খুব উচ্চ শ্রেণীর রচনা না হলেও সংস্কৃত নাটকে ভট্টনারায়ণ এক নতুন রীতির প্রবর্তক বলে স্বীকৃত হয়েছেন। বীর রসাত্মক এই নাটকটির ভাষা ওজঃগুণপ্রধান। নাট্যাংশের চাইতে কাব্যাংশের উৎকর্ষসাধনেই ভট্টনারায়ণ বেশী যত্নবান ছিলেন।

'অনর্ঘ রাঘব' এর রচয়িতা মুরারি (৯ম-১০ম শতাব্দী) সম্ভবতঃ বাঙালী নন। তিনি নিজেকে মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীবর্ধমানকের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাটকে কলচুরিবংশের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীর উল্লেখ করেছেন। মাহিষ্মতী বর্তমান নর্মদা তীরে অবস্থিত মান্ধাতা শহর। এই কারণেই মুরারিকে মাহিষ্মতী নগরীর অধিবাসী বলে অনুমান করা হয়। তবে তাঁর জন্মস্থান বা জীবৎকাল কোনটিই নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নি। বাঙালী কুলপঞ্জিকাকার-গণ 'অনর্ঘরাঘবের' রচয়িতা মুরারিকে বাংলাদেশে আগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ মুরারির সঙ্গে এক করে ফেলেছেন।

'চণ্ডকৌশিক' ও 'নৈষধানন্দের' রচয়িতা ক্ষেমীশ্বরকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাঙালী বলতে চেয়েছেন। তাঁদের এই দাবীর পেছনে যুক্তি এই যে, প্রথমতঃ ক্ষেমীশ্বর তাঁর 'চণ্ডকৌশিক' এর প্রস্তাবনায় মহীপালের নাম উল্লেখ করেছেন। মহীপাল পালবংশের অন্যতম রাজা। দ্বিতীয়তঃ এই নাটকের প্রাচীনতম পুঁথিটি নেপালে পাওয়া গিয়েছে। তুর্কী আক্রমণের সময় অন্যান্য গ্রন্থের মতই

না, এমন নয়। লোকায়ত জীবনে চিরকালই নৃত্য-গীতাদি অভিনয়ের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিভিন্ন উৎসবাদিকে উপলক্ষ করে গ্রামের অল্পশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষগুলি নিজেদের মত করে আনন্দোপভোগের আয়োজন করত। দুর্বোধ্য সংস্কৃতের মাধ্যমে নয়, তাদের মুখের ভাষাই ছিল রসোপভোগের মাধ্যম। প্রাচীন ভারতের নাট্যচিন্তার ক্রমবিকাশে যেমন দেখছি, প্রাচীন বাংলার নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল একই রকম। সংস্কৃত ভাষার কাব্য-নাটকগুলি পণ্ডিতসমাজের চর্চায় ও যত্নে কিছু কিছু রক্ষিত হয়েছে কিন্তু প্রাকৃত-জনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে রচিত কাব্য-নাটকের অধিকাংশই উপযুক্ত আশ্রয় ও যত্নের অভাবে লুপ্ত হয়েছে। অথচ সংস্কৃত ভাষার মতই প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাসও কম সমৃদ্ধ নয়। প্রাচীন কাল থেকেই প্রাকৃত কাব্য-মহাকাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষায় লেখা সুবিপুল জৈন সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও প্রাকৃত ভাষায় লেখা অনেকগুলি রামায়ণ-মহাভারত এবং পৌরাণিক আখ্যান ও চরিত কাব্য পাওয়া গিয়েছে। সংস্কৃত কাব্যের মত ভাবে-ভাষায়, ছন্দ-অলংকারে ও ঘটনার পারিপাট্যে সমৃদ্ধ অনেকগুলি প্রাকৃত কাব্যের সন্ধান ও নাম পাওয়া গিয়েছে। এই সব উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত থেকে একটা ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সুশিক্ষিত পণ্ডিত সমাজ দ্বারা অনুশীলিত সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি প্রাকৃত ভাষার চর্চাও কম হয় নি। কিন্তু রাজশেখরের একটি 'সট্টক' জাতীয় নাটক 'কর্পূর-মঞ্জরী' ছাড়া আর কোন প্রাকৃত নাটকের সন্ধানও পাওয়া যায় নি। প্রাকৃত নাটক যে ছিলই না, এমন কথাও বলা যায় না; নাট্যশাস্ত্রাদিতে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। দশরূপকের বাইরেও যে আরও বেশ কয়েক রকমের উপরূপক জনসমাজে প্রচলিত ছিল তার কথাও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারেরা স্বীকার করেছেন। বাংলা-

দেশেও এই ধরনের নাটক ছিল যা পরে যথোচিত সংরক্ষণের অভাবেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক , একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ।

সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' এ এমন অনেকগুলি নাটকের নাম আছে , যার অধিকাংশই বাঙালীর রচিত বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে । নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক ও লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সাগর নন্দী অনেকগুলি রূপক - উপরূপকের নাম উল্লেখ করেছেন । কতকগুলি নাটকের নাম সাগর নন্দী ছাড়া আগে বা পরে আর কেউই উল্লেখ করেন নি । যেমন ,'জানকী রাঘব' , 'রামাভ্যুদয়','মায়ামদালস' ,'নলবিজয়' ,'ভৈরবী পরিণয়' ,' পাণ্ডবানন্দ' , 'ভীমবিজয়' ,'কামদত্তা-পূর্তি' ,'রম্ভানলকুবর' ,'শতরেখা' , 'পার্বতী পরিণয়' , 'নরকোদ্ধরণ' ,'প্রাবেষ্ঠী' ,'পদ্মাবতী পরিণয়' ,'ললিতনাগর' , ঊষাহরণ' ইত্যাদি । এই নাটকগুলি সাগর নন্দীর সময়ে পূর্ব ভারত তথা বঙ্গদেশে সুপরিচিত ছিল এবং পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ লুপ্ত হয়েছিল । এই সব নাটকের রচয়িতা কে , কোথাকার লোক কিছুই জানা যায় না । এগুলি ছাড়াও সাগর নন্দী নাট্যাদিকের উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি নাটকের অংশের উল্লেখ করেছেন , মূল নাটকের নাম নেই । এগুলির রচয়িতার নাম ধাম কিছুই জানা যায় না । কয়েকগুলির নাম যেমন , -'অযোধ্যাভরত' ,'শীতকণ্ঠীয়' ,'কুন্দমালা নির্বাণ' ,'কৈকেয়ীভরত' , 'চিত্রশালিকা' ,'বিভীষণনির্ভর্ৎসন' -ইত্যাদি । সাগর নন্দীর' নাটকলক্ষণ রত্নকোষে' উল্লেখিত নাটকগুলির অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাটকাদি লেখার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা

ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখা যায়। অনুমান করা যায়, বাংলাদেশেও একসময় এই ধরনের নাটক-নাটিকা লেখা হয়ে থাকবে; সাগর নন্দী যেগুলি থেকে যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 'জানকী রাঘব' নামে একটি নাটকের নাম সাগর নন্দী তাঁর গ্রন্থে অন্ততঃ চারিশবার উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী কালে বিশ্বনাথও এই নাটিকটির নাম উল্লেখ করেছেন। নাটকটিও লুপ্ত। নাটকটির প্রতি সাগরনন্দীর আকর্ষণও পক্ষপাতিত্ব দেখে সন্দেহ হয়, এটি সাগর নন্দীর নিজেরই রচনা নয়ত? আরও দু একটি নাটক সম্পর্কেও এমন সন্দেহ করা যায়; যেমন, -'মায়ামদালসা', 'ভীমবিজয়', 'কামদত্তা' প্রভৃতি। নাটকগুলির রচয়িতা সাগর নন্দী না হলেও, এগুলি সম্ভবতঃ বাঙালীর রচিত এবং এতদঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

'নাটক লক্ষণরত্নকোশের আর একটি বিশেষত্ব হল, এই নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থেই সর্বপ্রথম উদাহরণসহ সতের প্রকার উপরূপকের আলোচনা পাওয়া যায়। সাগর নন্দীর সমসাময়িক অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত দশ-এগার প্রকার রূপকের অতিরিক্ত আরও কয়েক প্রকার রূপকের অস্তিত্ব স্বীকার করেও বলেছেন, সেগুলি রাগকাব্য ও নৃত্যাত্মক - নাট্যাত্মক নয়। ধনঞ্জয় (দশরূপক) উপরূপকের কথা বলেন নি, আচার্য ভরতের অনুসরণে শুধু নাটিকার লক্ষণ বর্ণনা করলেও তাকে তিনি সংকীর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। [৭] রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র (নাট্যদর্পণ) গ্রন্থে সংক্ষেপে তের প্রকার উপরূপকের উল্লেখ করেছেন। এই সব উপরূপকের রূপকত্বগুণ অল্প বলে পূর্বাচার্যগণ যে এগুলির কথা বলেন নি, অর্থাৎ তিনি বলেছেন। শারদাতনয় (ভাবপ্রকাশন',- অষ্টম-নবম অধিকার), বিশ্বনাথ ('সাহিত্যদর্পণ',

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) মতের প্রকার উপরূপকের উল্লেখ করেছেন । লক্ষণীয় যে , উপরূপকের আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তরসূরিগণ সাগর নন্দীর উদাহরণগুলিই গ্রহণ করেছেন । সাগর নন্দী ও বিশ্বনাথ উভয়েই পূর্বভারতের লোক ছিলেন । উপরূপকের আলোচনায় এই দুই আচার্যই মোটামুটি একই মত ও পথাবলম্বী । সাগর নন্দী উল্লেখিত উপরূপকগুলি বিশ্বনাথ স্বয়ং দেখেছিলেন কিনা আমরা জানি না তবে এগুলির উল্লেখ সাগর নন্দীই প্রথম করেন এবং বিশ্বনাথ তা অনুসরণ করেন । সুতরাং এই সব সঙ্গত কারণ দেখে সাগর নন্দী উল্লেখিত রূপক ও উপরূপকগুলির অধিকাংশই যে এতদঞ্চলে লিখিত অথবা প্রচারিত ছিল , এই সন্দেহই বিশেষভাবে প্রতীত হয় । রূপক-উপরূপকের উদাহরণস্বরূপ যে সব নাটকের নাম সাগর নন্দীই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন এবং বিশ্বনাথ ছাড়া অন্য কোথাও যেগুলির উল্লেখ প্রায় পাওয়া যায় না , সেগুলির তালিকা নিম্নরূপ :-

নাটিকা - প্রাযেগ্রী ।
প্রকরণ - পদ্মাবতী পরিণয় ।
পুষ্পদূষিতক ।

ডিম - নরকোদ্ধরণ ।
বৃত্রোদ্ধরণ বৃত্রোদ্ধরণ ।
সমবকার - পঞ্চানন্দ ।
ভাণ - পত্রলেখা ।
ললিতনাগর ।
উভাহরণ ।
ঈহামৃগ - উর্বশীমর্দন ।
কুন্দশেখর বিজয় ।

প্রহসন (শুদ্ধ) - শশিবিলাস ।

উপরূপক- সট্টক - কর্পূর মঞ্জরী ।
নাট্যরাসক - বিলাসবতী ।
প্রস্থানক - শৃঙ্গার তিলক ।
উল্লাপ্য - দেবীমহাদেবম্ ।
কাব্য - উৎকণ্ঠিত মাধব ।
প্রেঙ্খণ - বালিবধ ।
রাসক - মদনিকাকামুক (সা.দ.)
মেনকাহিতম্ (বি.ভ.)
সংলাপক - মায়াকাপালিক ।
শ্রীগদিত - ক্রীড়ারসাতল ।
শিল্পক - কনকবতী মাধব ।
কুন্দমালা ।
মায়াকুণ্ড ।
দশপক - কাপালিক ।

(সংকীর্ণ) - ভাবভঙ্গা । বাধাভ্যুদয় । রাঘবাভ্যুদয় ।

বীথী - রাধা । দুর্মল্লিকা - বিন্দুমতী ।

উপরূপক:- হল্লীশ - কেলি রৈবতক ।

ত্রোটক - মেনকানহুষ । ভাণিকা - কামদত্তাপূর্তি ।

গোষ্ঠী - সত্যভামা ।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী'তে দুটি শ্লোক আছে, যেখানে অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চপ্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে । প্রথম শ্লোকটি হল :-

" কিং হসথ কিং প্রধাবথ কিং জনমাহ্বয়থ বালকা বিফলম্ ।
তদয়ং দর্শয়তি যথাহরিরিষ্টং কণ্ঠগ্রহণেন জগৃহে ।।" ১৭৪"

"নায়ক-নায়িকার গুপ্ত মিলন প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় সখীর উক্তি : ওহে বালকগণ, অনর্থক হাসিতেছ কেন, (গুরুজনদের জানাইবার জন্য) দৌড়াইতেছ কেন, লোকজনই বা ডাকিতেছ কেন ? উনি কেমন করিয়া অরিষ্ট দৈত্যকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছেন (অভিনয় ছলে) ।"[৮]

দ্বিতীয় শ্লোকটি ,-

" ব্রীড়া প্রসরঃ প্রথমং তদনু চ রসভাবপুষ্টচেষ্টেয়ম্ ।
জবনী বিনির্গমাদনু নটীব দয়িতা মনো হরতি ।।" ৩৬৮

"যবনিকা অপসারিত হইলে নর্তকী যেমন প্রথমে সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া তাহার-পর রসভাবপুষ্ট অভিনয়ে সামাজিকের মনোরঞ্জন করে, দয়িতাও তেমনই ঘোমটা অপসারণে প্রথমে লজ্জা, তৎপরে পূর্ণ সুরত ভাবচেষ্টায় আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে।"[৯]

প্রথম শ্লোকটির 'দর্শয়তি' শব্দের দ্বারা অভিনয় করে দেখান অর্থ ব্যঞ্জিত হয়েছে । এবং দ্বিতীয় শ্লোকে নটী যেমন জবনী বা যবনিকা অপসারিত

হলে সংকোচ ত্যাগ করে রসভাবপুষ্ট অভিনয়ের দ্বারা দর্শক মনোরঞ্জন করে- এই উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোক দুটির বক্তব্য অনুধাবন করলে বুঝা যায়, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রীতিমত অভিনয় চর্চা হত। অভিনয়ে যবনিকা সম্বলিত রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার হত। নাট্যকলাও অনুশীলন সাপেক্ষ ছিল।' রসভাবপুষ্ট অভিনয়' - রীতিমত অনুশীলন প্রাপ্ত নাট্যাভিনয়েরই নির্দেশক। দর্শকগণও অভিনয় বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, রসভাবপুষ্ট অভিনয় দর্শন করে তার রসোপভোগের ক্ষমতা তাঁদের ছিল। এপর্যন্ত আলোচনায় আমরা এটুকুই দেখলাম যে, প্রাচীন বাংলায় নাটকের অস্তিত্বই শুধু ছিল না, নাটকের ভালরকম চর্চাও হত। পৌরাণিক - অপৌরাণিক বিবিধ বিষয়ের নাটকের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল। কিন্তু এই নাটকগুলিতে নৃত্য-গীতের কতখানি স্থান ছিল, তার কোন উল্লেখ আমরা পাই নি। শুধু অনুমানই করেছি যে, নৃত্য-গীতের প্রতি লোকমানসের স্বভাবিক অনুরাগের প্রতিফলন নাটকেও হয়েছিল। তখনকার লোকনাটকগুলি ছিল প্রধানত: নৃত্য-গীতময়।

উল্লিখিত অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হয় চর্যাপদের দুটি কবিতা থেকে। দশম সংখ্যক কবিতাটির রচয়িতা কাহ্নপাদ। এই পদের এক স্থানে তিনি তাঁর উপাস্যা মোক্ষদায়িনী নৈরাত্মাবধূটিকে (ডোম্বী) বলেছেন - "তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া' - ' নড়এড়া' শব্দটির অর্থ নটপেটিকা। মুনিদত্ত তাঁর টীকায় বলেছেন - ' নটবৎ সংসার পেটকং' - নটের পেটিকার মত সংসার পেটিকা। শব্দটি উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্যের প্রয়োজনানুরূপ সাজসজ্জা সম্বলিত যে পেটিকা - তাই নটপেটিকা। এই নটপেটিকাই সংসারের সঙ্গে উপমিত হয়েছে।

আমরা একথা জানি যে, চর্যাপদে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ গুহ্যসাধন-তত্ত্বকে পার্থিব জীবন থেকে নেওয়া নানা ঘটনা ও দৃশ্যের রূপকে বিধৃত করে বর্ণনা করেছেন। বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া প্রতীকগুলি সমকালীন সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্যই পরিবেশন করে। নটপেটিকা শব্দটিও এমনই একটি প্রতীক। চর্যাপদের কালে (খ্রীস্টীয় দশম - একাদশ শতাব্দীতে) বাঙালী সমাজে নটসম্প্রদায় ছিল, নৃত্য-গীতাভিনয় ছিল যাঁদের উপজীবিকা। এই নট - সম্প্রদায় সাজ-সজ্জা করে অভিনয় করতেন। নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করাই ছিল তাঁদের পেশা। এ ধরনের নটসম্প্রদায় যে শুধু দশম - একাদশ শতাব্দীতেই ছিল, তা নয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও আমরা এই নটসম্প্রদায়ের কথা পেয়েছি। প্রাচীন কালেও এঁদের অস্তিত্ব ছিল। চর্যাপদের কালেও ছিল, এমনকি আধুনিক কালেও এঁদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় নি। মধ্যযুগে ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদলের কথা আমরা জানি। এদের সঙ্গে সাজসজ্জা সম্বলিত বাক্স-প্যাটরা থাকত। প্রয়োজন হলে অভিনয়ের স্থান থেকেও তারা সাজসজ্জা সংগ্রহ করে নিত। একালের যাত্রা গাজনের নেটোর বা নেটোর দলেও এভাবে সাজ-পোষাক সংগ্রহ করার রীতির কথা জানিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন।[১০]

১৭ সংখ্যক কবিতাটিতে নৃত্য-গীত-অভিনয় প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ আছে। নাট্যারম্ভে যেমন আসর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যন্ত্রসঙ্গীত বা ঐকতান (Concert) বাদিত হয়, তেমনই এক ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত বা ঐকতান বাদনের বর্ণনা আছে পদটিতে। যদিও একথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দ্ব্যর্থব্যঞ্জক চর্যাপদের বাহ্যিক অর্থটি অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্যেরই রূপক। কিন্তু এই সব রূপক বা উপমা ব্যবহারিক জীবন থেকেই পরিগৃহীত। সুতরাং আলোচ্য পদের বাহ্যিক বর্ণনাটি সমকালীন

সমাজে প্রচলিত নাটগীতেরই পরিচায়িকা, তাতে সন্দেহ নেই। বর্ণনাটি এইরূপ, -

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দান্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা
সুণ-তান্তি-ধনি বিলসই রুণা।
আলি কালি বেণি সারি সুনিআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।
জবে করহা করহকলে চাপিউ
বতিস-তান্তি-ধনি সএল বিআপিউ।
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥

"সূর্য লাউ, চন্দ্রকে লাগানো হইল তাঁত, অনাহত দান্ডী, অবধূতী হইল চাকি। ওলো সই, হেরুকের বীণা বাজিতেছে, শূন্যতন্ত্রীর ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে ক্ষীণ সুরে। অ-বর্গ ও ক-বর্গ দুই সারিকা (স্বর ব্যঞ্জন) জানা গেল; গজবরের সমরস সন্ধি শোনা হইল। যখন হাতে করতলস্থাপনা হইল, তখন বত্রিশ তন্ত্রীর ধ্বনি সকল ব্যাপিল। বাজিল (হেরুক) নাচিতেছেন, দেবী (নৈরাত্মা) গাহিতেছেন। বুদ্ধের নাটগীত উলটারূপ (কেননা সাধারণ নাটগীতে পুরুষ গাহিত আর মেয়ে নাচিত) হইতেছে।" [১১]

শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ যাই হোক । এখানে বুদ্ধ - নাটকের প্রসঙ্গটিই গুরুত্বপূর্ণ । মুনিদত্ত অবশ্য এই পদের 'বুদ্ধনাটক' এর টীকায় লিখেছেন , - "পঞ্চতথা-গতানন্দেন বজ্রধর নৃত্যং করোতীতি নাচন্তী ইত্যাদি । বীণাপাদা বজ্রধর পদেন নৃত্যং কুর্বন্তি । তেষাং দেবী যোগিনী নৈরাত্মাভিধা গীতিকয়া গায়ন-স্বনং কুর্বন্তি । অতএব বুদ্ধনাটকং বিশিষ্টাধিমাত্রং সত্ত্বানাং স্বয়ং নির্বাণং ভবতীতি ।" সর্বসত্ত্বায় বিশেষরূপে নির্বাণ লাভই 'বিষয়:' । এইব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক, এই ব্যাখ্যার দ্বারা বুদ্ধ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গের আলোচনা নেই । এই পদটিতে আমরা এমন একটি বুদ্ধ নাটকের বর্ণনা পাচ্ছি , যাতে পুরুষ নাচছেন , নারী গাইছেন । এটি তান্ত্রিক যোগক্রিয়ার বিপরীত রতির ব্যঞ্জনাবাহী হওয়া অসম্ভব নয় । তবে নাট্যগীতিতে সাধারণতঃ পুরুষই গায়ক , নারী নৃত্যপরা । যে যাইহোক , বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে নাট্যাভিনয় করা ছিল একটি সাধারণ রীতি । আমরা দেখছি , বুদ্ধদেবের নিষেধ সত্ত্বেও বৌদ্ধ - সম্প্রদায় নাট্য - অভিনয়কে কেমন আঁকড়ে ধরে ছিল । সুতরাং চর্যাপদের বুদ্ধ - নাটক প্রসঙ্গটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে , অশোকের সময় থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের ধারাটিও চলে এসেছিল । এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিভিন্ন উৎসবে নাট্যাভিনয় চলত । এই নাট্যাভিনয়ের প্রধান অঙ্গ ছিল সম্ভবতঃ গীত-বাদ্য ও নৃত্য । গদ্যসংলাপ আদৌ কিছু থাকত কি না , তা অবশ্য এ থেকে বোঝা যাচ্ছে না । গদ্যসংলাপ থাকলেও , তা থাকত খুব সামান্যই । নৃত্যগীতের আকর্ষণই ছিল মুখ্য । আসলে নৃত্য-গীতই ছিল লোকনাট্যের মূল উপাদান , তা সে বৌদ্ধসম্প্রদায়েরই হোক , আর অবৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকনাট্যেরই হোক । নৃত্য-গীতিময় অভিনয় কলার ধারাটিই কালক্রমে মধ্যযুগের যাত্রাগানেও অনুসৃত হয়েছে ।

লোচন পণ্ডিতের 'রাগ তরঙ্গিণী' গ্রন্থে 'তুম্বুরু নাটক' নামে সংস্কৃত-ভাষায় লেখা একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। [১৮] গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি। কিন্তু 'রাগতরঙ্গিণী'তে 'তুম্বুরু নাটকে'র কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গ্রন্থটি বাংলা দেশেই রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ কোন বিশেষ নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কিত ছিল। যাই হোক, এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত একটি শ্লোকে সঙ্গীতের স্থান ও কাল দোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখক বলেছেন - 'রঙ্গভূমৌ নৃপাজ্ঞায়াং কালদোষো ন বিদ্যতে' - অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে বা রাজাজ্ঞায় সঙ্গীতের কাল দোষ থাকে না। 'তুম্বুরু নাটকের' এই মন্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন নাটকে বা নাটগীতিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সম্বলিত সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করেই যে লেখক এমন সিদ্ধান্ত বাক্য রচনা করেছেন, তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নৃত্য-গীতের যে বিশেষ সমাদর ছিল, তার প্রমাণ নানা জায়গা থেকেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত কতকগুলি বিশেষ ধরনের রাগ-রাগিণীও ছিল। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের ঘটনা নিয়ে লেখা 'সেক শুভোদয়া'র বিবরণগুলি যদি আংশিক সত্যও হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারি ঐ যুগের সাধারণ মানুষও কতটা নৃত্য-গীতাদির অনুরাগী ছিল। লক্ষ্মণ সেন স্বয়ং কাব্য-সাহিত্য, নৃত্য - গীতাদি অভিনয়ের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভায় পঞ্চরত্নের কথাও আমরা সবাই জানি। লক্ষ্মণ সেনের আমলে অভিনয়কলা যে কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার একটা উদাহরণ পাই বিদ্যাপতির 'পুরুষ পরীক্ষায়।' সেক শুভোদয়া'য় এ গাঙ্গোবটু ও তাঁর পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভার কথা আছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোন

বিস্তারিত বিবরণ সেখানে নেই। কিন্তু বিদ্যাপতির 'পুরুষ পরীক্ষায় তাঁর অভিনয় প্রতিভার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। যদিও 'পুরুষপরীক্ষা'য় গন্ধোনট নামটি ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ পাচ্ছি। 'পুরুষ পরীক্ষা'র বিবরণটি এই রূপ,-

"গৌড়দেশে লক্ষ্মণ সেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁর উমাপতি-ধর নামে মন্ত্রী ও গন্ধর্ব নামে নট ছিল। একদিন সভাকার্য শেষ করে রাজা বসে আছেন এমন সময় সেখানে নট এল, স্নান করে কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে। তাকে দেখে মন্ত্রী ঠাট্টা করে বললেন, 'ওহে গন্ধর্ব, কপালে একটা বিন্দু দেখছি যে! তবে কি তুমি 'নটং (ক্লীব)?' গন্ধর্ব উত্তর করলে, 'উমাপতিধর, দেখ আমার কণ্ঠে চন্দন বিন্দু, সুতরাং আমি হচ্ছি 'নটঃ (পুরুষ)'। তখন রাজা হাসলেন। মন্ত্রী উমাপতিধর চটে গিয়ে বললেন, ...'ওরে অধম নট চারণ জায়াজীব, খুব তো মুখ ছোটাচ্ছিস। তোর ধারণায় আমি উমাপতিধর কি তবে বলদ? নট বললে, 'আপনি বললেন, ক-এর মাথায় ফোটা দিলে 'কং' হয়, সেই হিসেবে তুই 'নটং'। 'নটং' বলতে কুজাতি, পুং, ক্লীব এই সব বোঝায়। এর উত্তরে আমি বলেছি, যেহেতু আমার (উপরে নীচে) দুটি বিন্দু রয়েছে (অতএব) আমি বিসর্গযুক্ত, যেমন 'কঃ' তেমনি 'নটঃ', মানে আমি সর্বজ্ঞ'। মন্ত্রী বললেন, 'যদি সর্বজ্ঞ হও তবে ভবভূতি রচিত উত্তর-চরিত নাটকের ছায়া নামক অংক আশ্রয় করে রামের আচরণ (ভূমিকা) অভিনয় কর দেখি।' নট বললে, 'করব অভিনয় (নাটয়িষ্যামি)'। রাজার কৌতূহল হল তিনি রং প্রভৃতি সজ্জা-দ্রব্যের যোগাড় করে দিলেন। পরে অভিনয় দেখবার সময় হলে সে রামের ভূমিকা নিয়ে নাচ (অর্থাৎ অভিনয়) জুড়লে। নাচতে

নাচতে সীতার স্পর্শ খুঁজতে গিয়ে স্পর্শ না পেয়ে (মূর্ছিত হয়ে) ধুলায় পড়ে গেল আর রামের ভাবে ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করে মুক্তি লাভ করলে । শ্লোক আছে-

আরণ্যানী স বটবিটপো হন্ত সৈব স্থলীয়ং
সীতা চৈব স্ফুরতি হৃদয়ং সোঽহমেবাস্মি রামঃ ।
এবং কান্তাবিরহবিলসদ্রামতাদাত্ম্যদীপ্ত্যা
নৃত্যাবেশান্ মুনিরিব নটো রামসাজুজ্যমাপ ।।

'সেই তো অরণ্যানী , সেই বটবৃক্ষ, এই সেই ভূমিখণ্ড । সেই সীতা আমার বুকে রয়েছে , আমিও তো সেই রাম' (এই ভাবে) প্রিয়বিরহবিলাস অভিনয়ে রামভাবেই ভাবিত হয়ে দুঃখ পেয়ে নট অভিনয়ের আবেগে রামের সাযুজ্য-মুক্তি পেয়ে গেল , (কঠোর তপস্যা করে) মুনিরা যা পায়''।১৩

এমন আবেগ-বিহ্বল তন্ময় অভিনয় অভিনয়-কলায় চরম উৎকর্ষেরই নিদর্শন । এধরনের তন্ময় অভিনয়ের কথা বৃন্দাবনদাসের ' শ্রীচৈতন্যভাগবতে' এবং মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গেও পাই । উদ্ধৃতাংশটি থেকে কয়েকটি তথ্যের সন্ধান পাই - বাংলা দেশে প্রাচীন কাল থেকেই নটবৃত্তি একশ্রেণীর লোকের জাতিগত জীবিকায় পরিণত হয়েছিল । এরা' নট' নামে পরিচিত ছিল । এই নট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতে পতঞ্জলির সময়েও ছিল ।' নট পেটিকা' নিয়ে এরাই ঘুরে ঘুরে নৃত্য-নাট্যাভিনয় করে জীবিকা নির্বাহ করত । কিন্তু জীবিকা হিসেবে নটবৃত্তি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বোধহয় তেমন মর্যাদাপূর্ণ ছিল না । পতঞ্জলির সময়েও আমরা নটসম্প্রদায়ের সামাজিক অমর্যাদার কথা জেনেছি । একালেও তাঁদের অবস্থার খুব উন্নতি হয়নি । নটেরা এখনও' অধম' ও' জায়াজীব' বলে নিন্দিত হয়েছে

নৃত্য গীতাভিনয় এঁদের জীবিকা হলেও এই বৃত্তিকে অনেকেই অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, ভাবতন্ময় অভিনয়ের দক্ষতাও ছিল এঁদের। নাট্যাভিনয়ে উপযুক্ত বেশবাস ও রঙ ব্যবহার করা হত। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় নৃত্য-গীতের সঙ্গে অভিনয়েরও ব্যবস্থা ছিল।

রাজা লক্ষ্মণ সেন গুণগ্রাহী ছিলেন। সঙ্গীত ও কাব্যরসিক লক্ষ্মণ সেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মত তাঁর রাজসভায় 'পঞ্চরত্নে' র আসর বসিয়েছিলেন। এই 'পঞ্চরত্নের' ই অন্যতম ছিলেন কবি জয়দেব। নৃত্য-গীত-বাদ্যে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীও নৃত্য-গীতে সমান পারদর্শিনী ছিলেন। জয়দেব ও পদ্মাবতীর অসামান্য সঙ্গীত-পারদর্শিতা নিয়ে এক মনোজ্ঞ গল্প আছে সেক শুভোদয়ায়। জয়দেব লোকপ্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রণয় প্রসঙ্গ নিয়ে একটি সুন্দর রসাত্মক 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' রচনা করেছিলেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তথা বাঙালীর নাট্যচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় যার আলোচনা অপরিহার্য। এই রচনাটি নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানারকম মতামত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ একে বলেছেন নিছক কাব্য, কেউ বা বলেছেন নাট-গীত, কারু কারুর মতে এটি বাংলা যাত্রার আদিরূপ।' গীত গোবিন্দ' মহাকাব্যের আদর্শে বারোটি সর্গে বিভক্ত। সর্গগুলি বিষয়বস্তু অনুসারে নামাঙ্কিত। অধিকাংশ সর্গই একাধিক 'গীতম্' -এ বিভক্ত। গানগুলির শীর্ষে যথোপযুক্ত সুর ও তালের নির্দেশ আছে। বারোটি সর্গে মোট গানের সংখ্যা চব্বিশটি। প্রতিসর্গের শেষে' ইতি শ্রী গীত গোবিন্দে মহাকাব্যে ... নাম প্রথমঃ সর্গঃ- সমাপ্তি সূচক বাক্য আছে। সর্গান্তে' মহাকাব্য' বলা হলেও,

গীতগোবিন্দকে যথার্থ মহাকাব্য বলা যায় না । মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সঙ্গে এই কাব্যের অনেক ক্ষেত্রেই বৈসাদৃশ্য আছে । কাব্যারম্ভে জয়দেব কিন্তু একে 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' ই বলেছেন । গ্রন্থটির নামকরণও এই কাব্যের গীতাত্মকতারই নির্দেশক । গোবিন্দের মাহাত্ম্য কীর্তনই (গান) যে কাব্যের লক্ষ্য সেই কাব্যের নাম 'গীত গোবিন্দ' - সার্থক । কাব্যটি যে প্রধানতঃ গীত হওয়ার জন্যই রচিত হয়েছিল , একটি প্রারম্ভিক ও একটি অন্তিম শ্লোক থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় । কাব্যারম্ভে কবি বলেছেন -

" যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্ ।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥" (১।৩)

-'যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করবার বাসনা থাকে , যদি তাঁর (বসন্ত-রাসাদি লীলার) বিলাসকলা (কলা-চাতুর্য) জানবার কৌতূহল হয় তবে জয়দেব রচিত এই মধুর - কোমল - কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন ।' উদ্ধৃতাংশের 'শৃণু' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কাব্যসমাপ্তি সূচক অন্তিম শ্লোকে তিনি পুনরায় বলেছেন -

"শ্রীভোজদেব প্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য ।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু ॥" (১২:২১)

'শ্রীভোজদেব ও বামাদেবীর পুত্র জয়দেব কবি শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করে পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে উপহার অর্পণ করলেন ।' উদ্ধৃতাংশটি থেকে মনে হয় সঙ্গীতাত্মক কাব্যটি কবি তাঁর পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুগণের দ্বারা গীত হওয়ার উদ্দেশ্যেই রচনা করেছিলেন । প্রথমসর্গের 'হরিবন্দনাত্মক' দ্বিতীয় 'গীতম্'

এর শেষে কবি বলেছেন -

''ত্বৎ চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥ ২৫ ॥

উদ্ধৃত চরণদ্বয়ের প্রথমটিতে 'ত্বৎ চরণে বয়ং প্রণতা ইতি' - অর্থাৎ আমরা তোমার চরণে প্রণত হয়েছি - তাতে একটি গায়কদলের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় চরণের' শ্রীজয়দেব কবির মঙ্গলাত্মক এই উজ্জ্বল রসের গান (স্তবের) আনন্দ-বিধান করুক' - অর্থে গীতগোবিন্দকে শৃঙ্গার রসাত্মক উজ্জ্বল বা মধুর রসের গান বলেই ব্যাখ্যাত করা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে যে, কবির নিজেরই একটি গানের দল ছিল। এই দলে কবি নিজে গাইতেন, কবিপত্নী গানগুলি নৃত্যে রূপায়িত করতেন। জয়দেবের গানের তালে তালে পদ্মাবতীর নাচের কথা ষোড়শ শতাব্দীর কোচবিহারের রাজসভাকবি রাম সরস্বতীর একটি কাব্যেও একাধিকবার পাওয়া যায় -

'কৃষ্ণের গীতে জয়দেবে নিযোজিত

মৃদঙ্গ তালের ভেদে নাচে পদ্মাবতী।'

গীতগোবিন্দের একটি শ্লোকে 'পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী' - এই কথাটি আছে। বাক্যাংশটির একটি প্রচলিত অর্থ হল -'যিনি পদ্মাবতীর চরণ-চারণদের অধ্যক্ষ'', - অর্থটিকে ডঃ সুকুমার সেন সঙ্গত বলে মনে করেছেন।[১৪] তিনি বলেছেন, -" চারণ"- নৃত্যকারীর চরণচালক মানে গায়ক ও বাদক। আর তাহাদের চক্রবর্তী বলিতে দলের অধিকারী।" কিন্তু বাক্যাংশটির ভিন্ন রকম ব্যাখ্যাও করেছেন কেউকেউ। পুরো শ্লোকটি উদ্ধৃত করা যাক, -

বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী ।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেতম্ -
এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥১ : ২॥

পূজারী গোস্বামীর (বালবোধিনী) টীকা:'পদ্মং বিদ্যতে করে যস্যাঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা পদ্মাবত্যাদীনামিত্যাদিপ্রমাণাদ্দীর্ঘঃ । তস্যাশ্চরণয়োর্নিত্য-ভূতয়োরেব চারণচক্রবর্তী নর্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ ।" ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্লোকটির অর্থ করেছেন -" যাঁহার মনোমন্দির বাগ্দেবতার চরিত্রচিত্রে অলংকৃত , যিনি পদ্মাবতীচরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক , সেই জয়দেব কবি শ্রী বাসুদেবরতিকেলিকথা সম্বলিত এই গ্রন্থ (গীতগোবিন্দ) রচনা করিলেন ।" পূজারী গোস্বামী ও ডঃ মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা ও অর্থ যথার্থ বলেই মনে হয় । এখানে পদ্মাবতী কবিপত্নী নন , তিনি পদ্মালয়া লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীরাধা । এই কাব্যের অন্যত্রও শ্রীরাধাকেই' পদ্মা' বলা হয়েছে ,-

" পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন -
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য ।" (১:২৩)

পূজারী গোস্বামী 'চরণচারণচক্রবর্তী' বাক্যাংশের টীকায় লিখেছেন ,- 'নর্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপরঃ' । জয়দেব যে নৃত্য-গীতকলাবিদ্ ছিলেন এবং নৃত্য গীতাদির দ্বারাই বাগ্দেবী ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের চরণসেবা করতেন , সে কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ।

কিন্তু শ্লোক ও চব্বিশটি গানের সমবায়ে রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনী নিয়ে আখ্যানকাব্যটি রচিত হয়েছে । শ্লোকগুলি সম্ভবতঃ গানের আগে আবৃত্তি করা হত । সম্পূর্ণ কাব্যটির মধ্যে যে একটি নাটকীয়তা আছে,

তা অস্বীকার করা যায় না । এই নাটকীয়তাটিকে সহজেই - নৃত্যে রূপায়িত করা যায় । সঙ্গীত ও নৃত্যকুশলী শিল্পিসম্প্রদায়ের পক্ষে এই আখ্যানটিকে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে রূপায়িত করাও অসম্ভব ছিল না । ভারতীয় তথা বাংলার লোকনাট্যেও নৃত্য-গীতেরই প্রাধান্য ছিল । সুতরাং লৌকিক নাটগীতের ধারাটিই জয়দেবে একটি পরিমার্জিত রূপ পেয়েছিল - এমন ধারণা একেবারে অমূলক নয় । সঙ্গীত ও নৃত্যের যৌথ ক্রিয়ার দ্বারা বর্ণনীয় বস্তুর নাটকীয় ব্যঞ্জনাটি সহজেই অভিব্যক্ত হতে পারে । সঙ্গীতের বর্ণনা ও সুরের তালে তালে নৃত্যের ছন্দ , মুদ্রার বিচিত্র কৌশল এবং শিল্পীর মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনাময় ভাবাভিব্যক্তি - এককথায় নৃত্যশিল্পীর বিচিত্র ভাব-ভঙ্গী ও আঙ্গিক ক্রিয়ার দ্বারা সহজেই একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকীয় পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে । কবির অন্তরের ভাব সুরে সমর্পিত হলে সঙ্গীত রূপে আত্মপ্রকাশ করে । কিন্তু এই সঙ্গীতের দ্বারা যখন ঈপ্সিত বস্তুর সম্যক উপলব্ধি হয় না , তখন সঙ্গীত ছন্দ সুষমাময় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে রূপময় হয়ে ওঠে ।

সঙ্গীত , নৃত্য ও নাটক - পারস্পরিক সম্পর্কে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত । নাটক থেকেই যেমন ভারতীয় রাগসঙ্গীতের বিকাশ হয়েছিল ,[১৩] তেমনি সঙ্গীতকে নৃত্যে নিবেশিত করে ভাব-রসময় নাটকীয়তা সৃষ্টি করার পদ্ধতি ভারতীয় নৃত্যের প্রাচীনতম ঐতিহ্য । ভারতীয় নৃত্য তিন ভাগে বিভক্ত - ক) নাট্য, খ) নৃত্ত , গ) নৃত্য ।

ক) নাট্য - রসাশ্রিত । ভাষা প্রয়োগের সঙ্গে অঙ্গ বিক্ষেপের দ্বারা কোন বিষয়কে ব্যক্ত করার নামই নাট্য ।

খ) নৃত্ত - তালাশ্রিত । তাললয় সহযোগে অঙ্গবিক্ষেপ করার নামই নৃত্ত ।

গ) নৃত্য - ভাবাশ্রিত । ভাষাপ্রয়োগ ছাড়া শুধুমাত্র সুকুমার অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা লীলায়িত ছন্দ ও তাললয় সহযোগে

কোন বিষয়কে ব্যক্ত করার মাধ্যমই নৃত্য ।

সমগ্র নৃত্যকলা ১) আঙ্গিক , ২) বাচিক , ৩) আহার্য , ৪) সাত্ত্বিক - এই চার প্রকার অভিনয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় । ভারতীয় নৃত্যের এই শ্রেণী-করণটি জানা থাকলে 'গীতগোবিন্দ'র নাট্যনৃত্যকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে ।

'গীতগোবিন্দ'- এর অন্তর্নিহিত নাট্যনৃত্যের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন-স্থানে বিভিন্ন দেবমন্দিরে দেবদাসীগণের দ্বারা এই 'মধুরমঞ্জুলগীতি' নৃত্য-সহযোগে অনুষ্ঠিত ও পরিবেশিত হত । দেবমন্দিরে দেবদাসীরা কিভাবে নানা আঙ্গিক ও মুদ্রার সাহায্যে 'গীতগোবিন্দ' এর 'নৃত্যাভিনয়' রূপায়িত করত তার একটা উদাহরণ (নৃত্যমুদ্রাসম্বলিত)' নৃত্যলক্ষণসহিতং গীতগোবিন্দকাব্যম্' (Gitagovinda with Abhinaya) গ্রন্থাকার থেকে প্রকাশ করেছেন পণ্ডিত - কে , বাসুদেব শাস্ত্রী । এই গ্রন্থে 'গীতগোবিন্দ' এর প্রতিটি গানের নৃত্যলক্ষণ দেখান হয়েছে । প্রথম সর্গের প্রথম 'গীতম্' - এর প্রথম শ্লোকটির আঙ্গিক নির্দেশ এই রকম , -

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং

বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং

কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ।

প্রলয় - পতাকাপরিঘর্ষিত পতাকেন গগনদৃষ্টা চ ।

পয়োধিজলে - অধঃস্বস্তিকীকৃতবিচ্যুতোর্ধ্বতলে পতাকাভ্যাম্ ।

ধৃতবানসি - অধোদেশাদুদ্ধৃতমুষ্টিনা ।

বেদং - পুরস্তান্নিকুঞ্চিতকেন ।

বিহিত - পৌনঃপুন্যীকৃত পতাকেন ।

বলিত — চালিতাঙ্গুষ্ঠকর প্রসারিতপদপুটেন।

চরিতং — প্রসারিতোর্ধ্বেন পতাকেন।

ভেদং — মুকুলে পতাকেন মুকুলয়া মুষ্ট্যা চ।

কেশব — কেশবন্ধেন।

ধৃত — আবর্তনেন মুখমুষ্টিনা।

মীনশরীর — মৎস্যহস্তেন।

জয় — উদ্যুক্ত হস্তকেন।

জগদীশ — ললাটস্পর্শাঙ্গুলিনা।

হরে — বেষ্টনস্পর্শনেন"।[১৬]

'গীতগোবিন্দ' উল্লিখিত আঙ্গিক নির্দেশ সহযোগে নৃত্যে রূপায়িত হত। নর্তকীর নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে চলত গীত-বাদ্য। আধুনিককালের কথাকলি ও ওড়িশি-নৃত্যের পরিবেশনার উৎস যে এই 'গীতগোবিন্দ'-এরই নৃত্য-নাট্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই নৃত্যাভিনয়ে গায়ক ও বাদকেরা থাকেন নেপথ্যে, গান ও বাজনার তালে তালে মঞ্চে নর্তকীরা বিবিধ ভাবভঙ্গী ও আঙ্গিকক্রিয়ার দ্বারা নৃত্যাভিনয় রূপায়িত করেন। এভাবে নৃত্যাভিনয় পরিবেশনার রীতিটি ভারতবর্ষে অনেক আগে থেকেই ছিল। এই রীতিটিই কোন একসময় হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাভা-বালি দ্বীপে গিয়েছিল। জাভা ও বালিদ্বীপের নৃত্য-নাট্যের রীতির মধ্যে পূর্বভারতীয় নৃত্য-নাট্যরীতির অনেকাংশে মিল আছে।[১৭]

'গীতগোবিন্দ' - এর এই নৃত্য-গীতিনাট্যরূপে প্রসিদ্ধির কারণেই দেশী-বিদেশী সমালোচকগণ একে নিছক কাব্য না বলে কেউ Lyric drama,

কেউ Pastoral drama, কেউ melo-drama, কেউ refined yatra, কেউ বা নাটগীতি বলে মনে করেছেন। 'গীতগোবিন্দ' এর গানগুলিতে গীতি-কবিতার লক্ষণ এবং রাধা-কৃষ্ণ ও সখীর সংলাপাত্মক সংগীতগুলির পরম্পরায় কাহিনীর নাটকীয় পরিণতি লক্ষ করে লাসেন একে 'Lyrical drama' বলে অভিহিত করেছেন। উইলিয়াম জোনস্ 'গীতগোবিন্দ'কে লোকনাট্যেরই মার্জিতরূপ মনে করে বলেছেন 'pastoral drama'। ক্রিস্চান লেভি 'গীতগোবিন্দ' এর মধ্যে সঙ্গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করে একে বলেছেন 'Opera'। পিসেল বলেছেন – 'melo-drama' অর্থাৎ গীতি-নাট্য (গ্রীক melos শব্দের অর্থ গান), শ্রোয়েডারের মতে 'গীতগোবিন্দ' 'a lyric-dramatic poem' এবং 'refined yatra'. ম্যাকডোনেল 'গীতগোবিন্দ' কে মোটামুটি Lyrical drama বলেই মনে করেছেন। ম্যাকডোনেল 'গীতগোবিন্দ' এর ইংরেজী করেছেন – 'Cowherd in Song'। উনিশ শতকের গোপাল উড়ের যাত্রার ইংরেজী নামকরণ 'Gopal's Flying Journey', র মত। [১৮] পরবর্তী কালে কীথও 'গীতগোবিন্দ' এর মধ্যে Lyric লক্ষণ ও বাংলা যাত্রার আদিরূপ দেখতে পেয়েছেন। কীথ তাঁর গ্রন্থের একাধিক স্থানে 'গীতগোবিন্দ' এ নাট্য-লক্ষণের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। [১৯] উইনটারনিৎস্ 'গীতগোবিন্দ' কে কিন্তু গীতি-নাট্য জাতীয় গ্রন্থ বলে মানতে চাননি। তাঁর মতে এটি মূলতঃ নৃত্য-গীতাত্মক কাব্য। [২০]

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের মত এদেশীয় পন্ডিতগণও 'গীতগোবিন্দ'কে সবাই একযোগে প্রাচীন যাত্রা বা নাটগীত বলে মেনে নেন নি। ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত 'গীতগোবিন্দ'কে 'যাত্রা' না বলে 'কাব্য'ই বলেছেন। [২১]

ডঃ সুশীল কুমার দে ও'গীতগোবিন্দ'কে 'দেশীয় গীতিনাট্য শ্রেণীর রচনা' বলে মনে করেন নি। ভাব ও রূপের দিক থেকে 'গীতগোবিন্দ'কে ডঃ দে সংস্কৃত সাহিত্যে এক নতুন কাব্যরীতির উদাহরণ বলে মনে করেছেন। ডঃ দে বলেছেন, -

> "বাহ্যতঃ নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও জয়দেবের রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্বস্ব ; ইহার গীতগোবিন্দ এই নামটিই তাহার নিদর্শন। কিন্তু মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীনতর গীতি কবিতার সহিত ইহার সাদৃশ্য অতি অল্প। অর্থ বিভাগ হইতে ইহাকে ঠিক কাব্য বলিয়াও ধরা যায় না। কারণ সর্গবন্ধ কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ইহাতে নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে আবার গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য শ্রেণীর রচনাও বলা যায় না। ভাব - প্রবণতায় ও গীতিবাহুল্যে দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রাচীন কৃষ্ণ যাত্রাদির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যবস্তু যৎসামান্য এবং যাত্রাদির মত ইহা সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত ও ব্যবহৃত হইলেও ইহা নিপুণ শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত লিপি-কুশলতায় সমৃদ্ধিশালী, বাগবহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও ইহার রচনা নিখুঁত ও নিপুণ শিল্পের পরিচায়ক।" [২২]

মহানাটকের সঙ্গে'গীতগোবিন্দ' এর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উভয় রচনাকেই প্রাচীন "Operatic and melodramatic" কৃষ্ণযাত্রার

'sublimated outcome' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু 'in the case of the Gitagobinda we have to reckon with the deliberate art of a creative mind'.[২৩] ডঃ দে 'গীতগোবিন্দ'কে আবেগাপ্লুত গীতিনাট্য কৃষ্ণযাত্রার মার্জিত রূপ বলে মেনে নিলেও, তিনি একে 'গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্বস্ব' অভিনব কাব্যশিল্প রূপেই গ্রহণ করেছেন।

ডঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর যাত্রা বিষয়ক বিখ্যাত গবেষণা পুস্তিকায় 'গীতগোবিন্দ'কে 'nothing but a sort of yatra in Sanskrit' বলে মন্তব্য করেছেন।[২৪]

ডঃ সুকুমার সেন 'গীতগোবিন্দ'কে 'গীতিনাট্য' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে "গীতগোবিন্দ আসলে গীতিনাট্য। যদিও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র সম্মত মহাকাব্যের পোশাক পরানো আছে তবুও মৌলিক নাট্যরূপটি ধরা কঠিন নয়।"[২৫] তিনি পরে আর একটি প্রবন্ধে (মঙ্গল যাত্রা, নাটগীত ও পাঁচালীকীর্তন: বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ) বলেছেন — "জয়দেবের কাব্যের গানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সেগুলির মধ্যে মৌলিক নাট্যগীতিকাব্যের সুস্পষ্ট-রূপ ধরা পড়ে।" এর পর ডঃ সেন ক্রমানুসারে চব্বিশটি গানেরই বিশ্লেষণমুখে এই কাব্যের নাট্য-গীতি লক্ষণটিকে প্রকটিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' এর উদাহরণ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে জয়দেবের 'নাটগীত' প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তাঁর 'নট-নাট্য-নাটক' গ্রন্থে 'বৃহদ্ধর্মপুরাণের' মধ্যখণ্ডের ত্রয়োদশ - চতুর্দশ পরিচ্ছেদের বৈকুণ্ঠপুরে শিবের সঙ্গীত পরিবেশন ও সেই সঙ্গীত শ্রবণে নারায়ণের দ্রবীভূত হওয়ার ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি

একে সেকালের একটি 'গীতাভিনয়' বলে উল্লেখ করেছেন।" এই অভিনয়ে কাহিনীর পাত্র-পাত্রী ছিল পুতুল। তাদের প্রবেশ নির্গম দেখিয়ে, সামনে রেখে ও অঙ্গভঙ্গি করিয়ে গায়ক-বাদক-নটীরা গান-নাচ-অভিনয় করত।"[২৬] জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এর অভিনয় ক্রিয়াটিও পুতুলনাচের মাধ্যমেই স সম্পাদিত হত বলে ডঃ সেন অনুমান করেছেন, -" জয়দেবের গীতগোবিন্দের অভিনয় পুতুলবাজিতে হত না, এমন কথা বলা যায় না।" [২৭] আসলে পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত পিশেলের 'puppet play' তত্ত্বটিকেই ডঃ সেন নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও যে ডঃ সেনের বক্তব্যগুলি একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হয় না, তা বলা যায় না। যাই হোক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই গীতগোবিন্দের মধ্যে প্রাচীন যাত্রার লক্ষণ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। গীত গোবিন্দে যে যাত্রার লক্ষণ আছে, একথা প্রথম বলেছেন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'যাত্রা' নামক গবেষণা নিবন্ধে। নিশিকান্তের সূত্র ধরেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতগোবিন্দে যাত্রার লক্ষণ অনুসন্ধান করেছেন। বাংলাদেশে যে 'যাত্রা' প্রচলন কবে থেকে হয়েছে তা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারেন না। নানাসূত্রে যে যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে যাত্রা-নাটের কোন সম্পর্ক আদৌ ছিল কিনা আমরা জানি না। প্রাচীন রীতির কোন যাত্রার উদাহরণও আমাদের হাতে নেই। নিশিকান্তের যাত্রা বিষয়ক গবেষণার মূল উপাদান ছিল উনিশ শতকের পালাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রাপালাগুলি। বস্তুতঃ একজন পালাকারের (যিনি অতি-সাম্প্রতিক

- কালের যাত্রাপালাকার, যখন যাত্রাগান অনেকখানি বিবর্তিত হয়ে আটোসাঁট একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে) যাত্রাপালাগুলির উপরে ভিত্তি করে প্রাচীন যুগের যাত্রার কোন ধারণায় উপনীত হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং একমাত্র কল্পনাশক্তি ছাড়া প্রাচীন যাত্রার কোনরূপই কল্পনা করা সম্ভব নয়। আমরা যে ধরনের নাট্যধর্মকে 'যাত্রা' বলে জানি তার উদ্ভব বাংলাদেশে অন্ততঃ চৈতন্যদেবের আগে নয়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেও আমরা কোন গ্রন্থেই যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাই না। যে সময় যে ধরনের নাট্যধর্মী গীতাভিনয় সর্বপ্রচলিত ছিল তার নাম নাটগীত। এই নাট গীতের ঐতিহ্য বহুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারত তথা প্রাচীন বাংলার লোক-নাট্যগুলি ছিল নাট-গীতেরই নানা রূপভেদ। এই নাটগীতেরই পরিমার্জিত ও সংস্কৃত রূপ গীতগোবিন্দ এবং চৈতন্যোত্তর কালে এই নাটগীতই ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে যাত্রাগানে।

গীতগোবিন্দ সম্পর্কে যাত্রাগানের ধারণাটির স্রষ্টা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। গীতগোবিন্দ সম্পর্কে রাখালী বিশেষণটির উৎস নিশিকান্ত উক্ত 'Idyll' বিশেষণটি। কিন্তু কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমানতায় গীতগোবিন্দ 'Idyll' হল সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কিছুই বলেন নি। বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী মাত্রই যদি রাখালিয়া হয়, তাহলে রাধা-কৃষ্ণাশ্রয়ী যে-কোন রচনাকেই আমরা রাখালিয়া বা 'Idyllic' বলে অভিহিত করতে পারি। নিশিকান্তের এই অভিমতটিই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা নানাভাবে গৃহীত ও বিশ্লেষিত হয়ে বিরাট জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এমনকি আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেউ কেউ মনে করেছেন, অপভ্রংশ ভাষার খোলস ছেড়ে যে কালে নবীন বাংলার জন্ম সূচিত হচ্ছিল, সেকালেই যাত্রাগানের উদ্ভব হয়েছে।[২৬] গীতগোবিন্দ তথাকথিত যাত্রা নয়, রাখালী নাটগীতও নয়ই। এপ্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের

একটি অভিমত প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, -

"গীতগোবিন্দ পদগান যদি সত্যই রাধানী নাটগীতি বা যাত্রায় পূর্ণাঙ্গ নাটগীতি দেখা যেত, তাহলে তাতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট অভিজাত তথা ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের রাগ-তালের কোনও সার্থকতা থাকত না। অবশ্য গীতিরস ও কাব্যরসের আনন্দের দিক থেকে অনেকে 'গীতগোবিন্দকে গীতিরসাঢ্য আখ্যান কাব্য বলে সিদ্ধান্ত করেন এবং সে সিদ্ধান্ত সাহিত্যের রূপ ও রসদৃষ্টির দিক থেকে কিছুটা সত্য। মনে হয়, 'গীতগোবিন্দ' - পদগানের গোত্র বা পর্যায়নির্ধারণ ব্যাপারে কেবলই রস ও ছন্দানুবিদ্ধ সাহিত্য-দৃষ্টি কিংবা সঙ্গীতদৃষ্টি নিয়ে বিচার না করে সামগ্রিক ভাবে এবং বিশেষ করে এর আনুষঙ্গিক অথবা অপরিহার্য সহায়ক সামগ্রী শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ, রাগ ও তাল সম্পৃক্ত পদসাহিত্য, আখ্যান ও নৃত্যরূপের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।" ২১

-গীতগোবিন্দ 'রাগ-তাল-সম্পৃক্ত পদসাহিত্য, আখ্যান ও নৃত্যরূপে' অবশ্যই বিশ্লেষিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু নৃত্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে যে অভিনেয়তা, সেই বৈশিষ্ট্যটিকে কি উপেক্ষা করা যায়? নৃত্যের অভিব্যক্তি ও অভিনেয়তাতেই। দক্ষিণ ভারতের কেরলে 'কথাকলি' সৃষ্টির আগে ও ভাগবতের কাহিনী অবলম্বন করে 'কৃষ্ণ আট্টম' নামে এক ধরনের নৃত্য-নাট্যের উদ্ভব হয়। ৮২১ মালয়ালম্ অব্দ বা ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরলের কোঝিকোড় রাজ্যের জমিদার মানবেদন এই নৃত্যনাট্যের রচনা করেন। 'কৃষ্ণ আট্টম্' গীতগোবিন্দের অনুকরণেই

রচিত হয় । কৃষ্ণঅট্টমের গানগুলি 'কৃষ্ণপদী' বা 'কৃষ্ণগীতি' নামে পরিচিত ছিল । শোনা যায় কৃষ্ণ অট্টমের আগে কেরলে 'অষ্টপদীয়ম্' বলে একটি নৃত্য-নাট্যের প্রচলন ছিল । হয়ত, সেটিও গীতগোবিন্দের আদর্শেই রচিত হয়েছিল । কৃষ্ণ অট্টমের বিষয় ছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী । নৃত্যাভিনয় কালে গাইয়েরা পর্দার আড়ালে থেকে গান করতেন আর নৃত্য-শিল্পীরা মঞ্চে নানাবিধ আঙ্গিক ক্রিয়ার দ্বারা অভিনয়টি ফুটিয়ে তুলতেন । এই কৃষ্ণ অট্টমের আদর্শেই সৃষ্ট হয় 'রাম অট্টম' এবং তারপর 'কথাকলি' । এই কথাকলির পরিবেশনাও হয় কৃষ্ণ অট্টমেরই অনুকরণে । উড়িষ্যায় গীতগোবিন্দচর্চার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব এই মর্মে একটি রাজাদেশ জারি করেন যে কোন দেবদাসী এবং বৈষ্ণবীই গীতগোবিন্দের গান ছাড়া আর কিছু গাইতে পারবে না । [৩০] নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে গীতগোবিন্দচর্চা এখনও ওড়িশি নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

গীতগোবিন্দের সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে যদি এর নৃত্যের ব্যাপারটিকেও মেনে নি, তবে এর নাটকীয়তাকেও স্বীকার না করার কোন কারণ নেই । গীতগোবিন্দের একটি শ্লোক আছে -

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্ ।
হরিবিরহাকুল - বল্লবযুবতি-সখিবচনং পঠনীয়ম্ ॥ ৪ : ৯॥

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা পূজারী গোস্বামী করেছেন -' যদি মনসা নটনীয়ং নর্তয়িতব্যং', ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় করেছেন -' যদি মনকে আনন্দে নাচাইতে চাহেন', রাণাকুম্ভের ব্যাখ্যা -'নটনীয়মভিনয়াস্বাদনীয়ম্,

রসনীয়ুমিতি যাবৎ। নাট্যশব্দো রসে মুখ্যঃ ইতি তত্তীয়ে।" উইনটারনিৎস্ ব্যাখ্যা করেছেন - " his song is to be staged in mind (manasa-natanIyam)" [৩১] উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে সামান্য ইতর-বিশেষ থাকলেও গীতগোবিন্দের অন্তর্নিহিত নৃত্যাভিনেয়তাকে মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গীতগোবিন্দকে 'পাঁচালী কাব্যই বলতে চেয়েছেন। নাটগীত, যাত্রা প্রভৃতির চাইতে মধ্যযুগের পাঁচালীর সঙ্গেই তিনি এর সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, -

" আমাদের অনুমান (এবং 'সাস্থ্য রয়া' প্রমাণের অভাবে অনুমান ছাড়া গত্যন্তর নেই), 'গীতগোবিন্দ' এর শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হত এবং 'গীতম্' বা 'পদম্' গুলি রাগ-তালে গান করা হত। 'গীতগোবিন্দ' এর 'গীত' শব্দের মধ্যে গানের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সুতরাং একাব্যকে যাত্রার চেয়ে বরং পাঁচালীর পূর্বরূপ বলে গ্রহণকরা যায়। পরে প্রয়োজনানুসারে, বৈচিত্র্যের অনুরোধে এবং জনরুচির চাহিদার ফলে মঠ-মন্দিরে দেবদেবীর উৎসবে এ গান পরিবেশন করার সময়ে নৃত্য সংযোজিত হয়। নৃত্য-গীত-আবৃত্তিময় আখ্যানকাব্য হিসেবেই 'গীতগোবিন্দ'কে নির্দেশ করতে হবে, যাত্রাগান বা নাট গীত পালা বলে একে গণ্য করা দুষ্কর। তবে পরবর্তিকালে কৃষ্ণযাত্রার বিবর্তনে 'গীতগোবিন্দ' এর বিশেষ প্রভাব ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।" [৩২]

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রণিধান যোগ্য। গীতগোবিন্দ যে আবৃত্ত ও গীত হত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঁচালীর গীতরীতির

সঙ্গে গীতগোবিন্দের গীত-রীতির পার্থক্যটি বড় কম নয়। পাঁচালীর মূল গায়েন পাঁচালীর আখ্যানটি আবৃত্তি ও গীতসহযোগে পরিবেশন করতেন। ধ্রুবপদগুলি মূলতঃ দোয়ারকি বা দোয়ারগণ মূল গায়েনের সঙ্গে ধুয়া হিসেবে গাইতেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র্য বা গানের সূক্ষ্ম নিপুণতার চাইতে আখ্যান বর্ণনাই ছিল সেখানে প্রধান লক্ষ্য। গীতগোবিন্দ পাঁচালীর মত যথার্থ আখ্যান কাব্যও নয়। এই কাব্যের আখ্যান অতি সামান্য – যেকোন পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করলেই এর আখ্যানের সামান্যতা উপলব্ধি করা যাবে। অভিসারিনী রাধার মানভঞ্জন ও অবশেষে রাধা-কৃষ্ণের মিলন – এই ঘটনাটিকে আশ্রয় করে সঙ্গীত-নাটিক রচনা করা যায়, ঠিক পাঁচালী রচনা করা যায় না। পাঁচালী কাব্যগুলিতে যে ত্রিপদীগুলি থাকত তা সুরে গাওয়া হলেও কাহিনী অংশ বর্জিত হত না। অথচ গীতগোবিন্দের গানগুলিতে আখ্যান বর্ণনার চাইতে নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্তিই প্রধান। [৩৩] গীতগোবিন্দের কবি কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতগুলিও রচনা করেছেন, সেইসব সঙ্গীতের রাগ-তালেরও নির্দেশ করেছেন। পাঁচালীকার পাঁচালীর আখ্যান ভাগ রচনা করেন। গায়েন ইচ্ছে মত তাতে সুর-তাল সংযোজনা করেন। সুতরাং এসব কারণেই গীতগোবিন্দকে 'পাঁচালী রীতির আদিরূপ ও ভক্তিরসাশ্রিত আখ্যানকাব্য' [৩৪] বলে মনে করা যায় না। গীতগোবিন্দের সঙ্গে নৃত্যের সংযোগ জয়দেবের আমলেই হয়েছিল, না পরবর্তী কালে হয়েছিল – তা স্পষ্ট করে কিছুই বলা যায় না। কিম্বদন্তী অনুসারে গীতগোবিন্দের গান গাইতেন স্বয়ং কবি আর নাচতেন কবি পত্নী। এই কিম্বদন্তী কতদূর সত্য সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ করা যায়। কিন্তু গীতগোবিন্দ

রচিত হওয়ার পর থেকেই গ্রন্থটি নৃত্য-গীতাত্মকতার মর্যাদা পেয়ে এসেছে। গীতগোবিন্দ প্রথমাবধিই নৃত্যাত্মক ছিল, না পরবর্তী কালে হয়েছে - যখন কোন প্রমাণই ('পাণ্ডুলিপি') আমাদের হাতে নেই, তখন গ্রন্থটি দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা যে রূপে পেয়ে এসেছি সে ভাবে দেখাটাই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া পরবর্তী কালের কৃষ্ণযাত্রার বিবর্তনে গীতগোবিন্দের প্রভাবটি আমরা অস্বীকার করতে পারছি না। সুতরাং গ্রন্থটিকে নিছক কাব্য বা পাঁচালী জাতীয় গ্রন্থ বলা যায় না। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যে বলেছেন, এই গ্রন্থটিকে "শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ, রাগ - তাল - সম্পৃক্ত পদ সাহিত্য, আখ্যান ও নৃত্যরূপেই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন," - সে কথা যুক্তিযুক্ত। অবশ্য একথা আমরা বলেছি, গ্রন্থটি নৃত্যরূপে বিশ্লেষিত হলে এর নটকীয়তাটিকেও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

গীতগোবিন্দ যে বাংলাদেশে প্রচলিত নাটগীত শ্রেণীরই মার্জিত ও শাস্ত্রীয় সংস্করণ তাতে সন্দেহ নেই। চর্যাপদেও আমরা এক ধরনের নাটগীতের সন্ধান পেয়েছি। এর পরেও নাটগীতই বাংলাদেশে অন্ততঃ পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রেই পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর অসমীয়া ভক্ত কবি শঙ্কর দেব যে ক'টি নাটগীত রচনা করে-ছিলেন, গীতগোবিন্দের প্রকরণের সঙ্গে সে গুলির প্রকরণের অনেক সাদৃশ্য আছে। শঙ্করদেব স্পষ্টতঃ গীতগোবিন্দের প্রভাব কোথাও স্বীকার করেন নি। কিন্তু গীতগোবিন্দের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র্য এবং শঙ্কর দেবের নাটকাবলীর

আখ্যান প্রাধান্য ছাড়া উপস্থাপনা প্রভৃতি প্রায় সবদিক থেকেই গীতগোবিন্দের সঙ্গে শঙ্করদেবের নাটগীতগুলির গভীর সাদৃশ্য আছে। শঙ্করদেব সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষতঃ গীতগোবিন্দের দ্বারা প্রভাবিত হননি। মনে হয়, মধ্যযুগীয় কালে এতদঞ্চলে প্রচলিত নাটগীত রীতিকে অনুসরণ করেই তিনি তাঁর নাটগীতগুলি রচনা করেছিলেন এপ্রসঙ্গে একথাও এখানে স্বীকার করা ভাল যে, তখনকার দিনের যাত্রার কোন নিদর্শন যেমন আমাদের হাতে নেই, বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ ছাড়া নাটগীত কি ধরনের ছিল তারও কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। তবু কিছু কাল পরের শ্রীচৈতন্য-দেবের নৃত্যাভিনয় ও শঙ্করদেবের নাটগীতির উদাহরণ থেকে পূর্ববর্তী কালের নাটগীতের একটা ধারণা পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দ মূলতঃ গীতিধর্মী কাব্যগ্রন্থ, এতে একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যানও আছে। এই আখ্যানটি যে ভাবে বিবৃত হয়েছে তাকে সহজেই নাট্যাকারে (অঙ্কবন্ধনে) বিন্যস্ত করা যায়। গীতগোবিন্দের অন্তর্নিহিত নাট্যরূপটিকে বিন্যস্ত করে দেখলে পরবর্তীকালের নাটগীতগুলির সঙ্গে এর সাদৃশ্যটি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। গীতগোবিন্দের নাট্যাংশটি বিন্যস্ত করে দেখানোর আগেই কাব্যটি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। গীতগোবিন্দের পাত্র-পাত্রী তিনজন - রাধা, সখী এবং কৃষ্ণ। ঘটনাস্থান - যমুনাতীরবর্তী দুটি কুঞ্জ-একটি লতাকুঞ্জ (যেখানে রাধা আছেন), অপরটি বেতসকুঞ্জ (যেখানে কৃষ্ণ আছেন)। কেন্দ্রীয় বিষয় খণ্ডিতা রাধার মান ও মানান্তে রাধা-কৃষ্ণের মিলন। ঘটনা কাল দু'রাত একদিন। প্রথম সর্গের কাল নিয়ে একটু বিভ্রান্তির কারণ ঘটে। কেননা, কাব্যের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, -

" মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং"

কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিলাসের আখ্যান যেখান থেকে শুরু, অর্থাৎ প্রথম - সর্গের তৃতীয় 'গীতমে'র কালটি বসন্তকাল -

" ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে ।

মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ।।"

এখানে মধুকর নিকরের গুঞ্জন, কোকিলের কূজন শোনা যাচ্ছে; মলয় বায়ু বইছে, 'অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে' - (১/২৬) । সখী রাধাকে অদূরবর্তী গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে কেলিবিলাসরত কৃষ্ণকে দেখাচ্ছেন, বসন্তকালীন প্রকৃতি-শোভা দেখাচ্ছেন ইত্যাদি । দ্বিতীয় সর্গের প্রথমেই বলা হচ্ছে -

ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলীমুখরশিখরে' -

মধুকর মুখরিত একলতাকুঞ্জে বসে রাধা সখীকে বললেন । ঐ সর্গেরই পঞ্চম শ্লোকে রাধা প্রথম সর্গের পঞ্চম গীতের বর্ণিত ঘটনার অনুচিন্তন করে বললেন, -

"বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহস্রম্ ।

করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ " ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণের বক্ষের মণিভূষণের ছটায় অন্ধকার অপসারিত হয়েছে । - তাহলে প্রথম সর্গের ঘটনাকালকেও রাত্রিই ধরতে হয় । প্রথম সর্গের ঘটনাকাল যদি রাত্রি হয়, তবে তার পরের ঘটনা দ্বিতীয় সর্গের কালও রাত্রিই হবে । তবে, ঐ সর্গেরই বিংশতি শ্লোকে রাধা বলেছেন, -

'অপি ত্রাসাচ্ছন্নীতিরমণীয়া ন মুকুল -

প্রবৃত্তিশ্চ তানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ।।'

-'সন্তরণশীল ভ্রমরগুঞ্জরণে মুখরিত এই রমণীয় আম্রমুকুল দর্শনেও আমার আনন্দ হচ্ছে না।'

- এই সব বর্ণনা থেকে কালনির্ণয়ে যে সমস্যাটি দাঁড়ায় তা হল, সন্ধ্যায় বা রাত্রে ও অলিগুঞ্জন শোনা যেতে পারে না, প্রাকৃতিক শোভাও দেখা যেতে পারে না। দিনের বেলা না হলে ও এগুলি সম্ভব নয়। আবার প্রথম শ্লোকে 'মেঘৈর্মেদুরম্বরং' বলে পরেই বসন্তকাল, মলয় বায়ুর কথা কেমন যেন স্ববিরোধী বলে মনে হয়। ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য বলেছেন, প্রথম শ্লোকটি জয়দেবের লেখা নয়, [৩৫] কিন্তু এটি নিছক অনুমান। এধরনের বিভ্রান্তিকর বর্ণনা এই কাব্যের অন্যত্রও আছে। পঞ্চম সর্গের কাল রাত্রির প্রথম যাম, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। কৃষ্ণ 'দহতি শিশির ময়ূখে' - চন্দ্রকিরণে তিনি দগ্ধ হচ্ছেন (৫।৩) কিন্তু পরের শ্লোকেই আছে, -'পততি মধুপ-সমূহে শ্রবণমপিদধাতি' - অলিগুঞ্জন শুনে তিনি কান ঢাকছেন। এখানেও রাত্রিকালে অলিগুঞ্জন। ৫।১১ শ্লোকে আছে, 'পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে' - পাখী উড়ছে, গাছের পাতা নড়ছে, - কিন্তু পরের শ্লোকেই সখী রাধাকে বলেছেন -'চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং'। এধরনের কালগত বর্ণনার পরম্পরা আরও কিছু আছে। এগুলি উপেক্ষণীয়। কাব্যের খাতিরেই এই কালানৌচিত্য দোষগুলিকে 'আর্ষপ্রয়োগ' বিবেচনা করতে হবে। সখি রাধাকে এই রাত্রিকালেই (৩) দূরবর্তী কৃষ্ণগোপবধূগনের বিহার ও নৃত্য দেখিয়েছেন, বাসন্তিক প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়েছেন, অলিকুল ও ভ্রমরা-ভ্রমরী গুঞ্জন করছে - ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। তাহলে এবার আমরা বলতে পারি গীতগোবিন্দের ১ম থেকে ৭ম

সর্গ পর্যন্ত ঘটনা কাল প্রথম রজনী, বসন্তকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। অষ্টম ও নবম সর্গের ঘটনা কাল পরের দিন প্রভাত। -

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়

স্মরশরজর্জরিতাপি সা প্রভাতে ॥ ৮ : ১ ॥

১০ ম সর্গের কাল ঐদিনেরই প্রদোষ -

'অত্রান্তরীক্ষিত মধীবদনাং প্রদোষে'॥ ১০ : ১ ॥

এবং ১১ শ ও ১২ শ সর্গের কাল এর পরবর্তী নিবিড় অন্ধকারময়ী প্রদোষে (১১।১) গীতগোবিন্দের ঘটনাকাল সাকুল্যে ২ রাত্রি ১ দিন, মোটামুটি কিঞ্চিদধিক ২৪ ঘন্টা। এবার সঙ্গীত নির্দেশাদি অংশগুলি বাদ দিয়ে গীতগোবিন্দের নাট্যাংশটিকে গীতিনাট্যের আকারে বিন্যস্ত করে দেখানো যেতে পারে।

প্রথম: সর্গ:

সামোদ-দামোদর:

উক্তি - মেঘৈর্মেদুরমম্বরং - শ্লোক - ১।

প্রস্তাবনা - কবিনাম ও বিষয় বর্ণন - শ্লোক - ২ - ৪।

পূর্বরঙ্গ - মঙ্গলাচরণ - গীতম্ ॥ ১ ॥ দশাবতার বন্দনা।

নান্দী - গীতম্ ॥ ২ ॥ শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল - ইত্যাদি - শ্লোক - ১৭ - ২৬।

নাট্যারম্ভ

কাল - বসন্ত

সময় - সন্ধ্যা

স্থান - যমুনা তীরবর্তী কোন স্থান।

সূত্রধার।

বসন্তকালে যখন (একদিন)'কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুল' রাধা বৃন্দাবনের নিভৃত-স্থানে বহুযত্নে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করছিলেন - এমন সময় এক সখী এসে তাঁকে বললেন - শ্লোক - ২৭ ।

সখী (রাধাকে) - গীতম্ ॥ ৩ ॥

সখী : এই 'সরসবসন্তে' হরি গোপযুবতীগণের সঙ্গে বিহার ও নৃত্য করছেন । ইত্যাদি (সখী দূর থেকে রাধাকে হরির বিহার লীলাদি দেখালেন) । শ্লোক- ২৮ - ৩৪ , ৩৬ - ৩৮ ।

ভণিতা শ্লোক - ৩৫ ।

সূত্রধার ।

'অনেক নারী পরিরম্ভ বিলাসলালস' মুরারিকে দূর থেকে দেখিয়ে সখী পুনরায় রাধাকে বললেন - শ্লোক - ৩৯ ।

সখী (রাধাকে) - গীতম্ ॥ ৪ ॥

মুরারি গোপবধূগণের সঙ্গে নানারসে কেলিবিলাসে মত্ত হয়েছেন । গোপযুবতীগণ এক এক জন এক এক ভাবে কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ উপভোগ করছেন (তার বর্ণনা) - শ্লোক- ৪০ - ৪৫ ও ৪৮ ।

ভণিতা - শ্লোক - ৪৭ ।

তত্ত্ববাক্য - শ্লোক - ৪৯ ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অক্লেশ - কেশবঃ

কাল ও সময় পূর্ববৎ

স্থান - যমুনা তীরবর্তী লতাকুঞ্জ

সূত্রধার ।

রাধা সব দেখেশুনে ঈর্ষা ও অভিমান ভরে সেই স্থান ত্যাগ করে একলতাকুঞ্জে গিয়ে বসলেন এবং প্রতি দীনার মত সখীকে এই গোপন কথাগুলি বলতে লাগলেন -

শ্লোক - ১ ।

রাধা (সখীকে) - গীতম্ - ॥ ৫ ॥

আজ যে - মাধব অন্য গোপবধূবর্তী গণের মধ্যে বিহার করছেন তাকি অন্তরে অন্তরে তাঁকেই কামনা করছি । ইত্যাদি । শ্লোক - ২ - ৮ , ১০ ।

ভণিতা - শ্লোক - ৯ ।

পুনরায় , রাধা (সখীকে) গীতম্ ॥ ৬ ॥

এই গীতে রাধা সখীর কাছে তাঁর পূর্বানুস্মৃতিচারণা করছেন এবং বর্তমান হরিবিরহ-জনিত ক্লেশের কথা জানাচ্ছেন , শ্লোক - ১১ - ১৭ , ১৯ - ২০ ।

ভণিতা - শ্লোক - ১৮ ।

উক্ত বাক্য - শ্লোক - ১৯ ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

মুগ্ধ - মধুসূদনঃ

স্থান - যমুনা তীরবর্তী বেতসকুঞ্জ

সময় - পূর্ববৎ

সূত্রধার ।

(এদিকে) কৃষ্ণও 'সংসার - বাসনাবদ্ধ - শৃঙ্খলরূপিণী' রাধার কথা চিন্তা করতে করতে ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গত্যাগ করলেন এবং 'অনঙ্গবাণবিদ্ধ - মানসে' ইতস্ততঃ অনুসরণ করেও রাধার দর্শন না পেয়ে যমুনা তটবর্তী কুঞ্জে বিষাদে

এই বলে অনুতাপ করতে লাগলেন , - শ্লোক - ১ - ২ ।

কৃষ্ণ (আত্মগত) গীতম্ ॥ ৭ ॥

রাধা আমাকে ব্রজগোপীগণের সঙ্গে বিহাররত দেখে রোষ ভরে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি নিজ অপরাধ ভয়ে তাঁর গমন নিবারণ করতে পারি নি । এখন রাধা কি করছেন , রাধা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ । ইত্যাদি ।

শ্লোক ৩ - ৯ , ১১ - ১৩ ।

ভণিতা শ্লোক - ১৩ ।

ভক্ত বাক্য শ্লোক - ১৬ ।

চতুর্থঃ সর্গঃ

স্নিগ্ধ - মধুসূদনঃ

স্থান - বেতস কুঞ্জ

সময় - পূর্ববৎ (চন্দ্রোদয়ের প্রাক্কাল)

সূত্রধার ।

যমুনা তীর বর্তী নিকুঞ্জে বিষণ্ণ চিত্তে অবস্থিত 'প্রেমভরোদ্ভ্রান্ত' মাধবকে রাধার সখী এসে বললেন , - শ্লোক - ১ ।

সখী (কৃষ্ণকে) গীতম্ ॥ ৮ ॥

হে মাধব , তোমার বিরহে রাধা অত্যন্ত কাতরা হয়েছেন , প্রতি মুহূর্তে তোমার সঙ্গ কামনা করছেন । ইত্যাদি । শ্লোক ২ - ৮ , ১০ ।

ভণিতা শ্লোক - ৯

পুনরায় সখী (কৃষ্ণকে) গীতম্ ॥ ৯ ॥

কেশব তোমার বিরহে রাধা কৃশতনু হয়েছেন ,'স্তনবিনিহিত' হারও তার কাছে ভার বলে বোধ হচ্ছে । তাঁর অশ্রুসিক্ত আঁখি দিকে দিকে তোমাকেই খুঁজছে -

তুমি তাঁকে কৃপা কর। ইত্যাদি। শ্লোক - ১১ - ১৭, ১৯ - ২২।

ভণিতা শ্লোক - ১৮।

ভক্ত বাক্য শ্লোক - ২৩।

পঞ্চম সর্গঃ

সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষঃ

স্থান - রাধার লতাকুঞ্জ

কাল ও সময় - পূর্ববৎ

সূত্রধার

কৃষ্ণ সখীকে অনুরোধ করছেন রাধাকে বেগে কুঞ্জে নিয়ে আসবার জন্য।

কৃষ্ণ কর্তৃক নিযুক্তা সখী রাধার কাছে গিয়ে এই কথা বলছেন - শ্লোক - ১।

সখী (রাধাকে) গীতম্ ॥ ১০ ॥

সখি, তোমার বিরহে কৃষ্ণ অতিশয় কাতর হয়ে পড়েছেন। তোমার নাম করে বিলাপ করছেন আর ভূমিতে লোটাচ্ছেন। ইত্যাদি। শ্লোক ২ - ৫, ৭।

ভণিতা - শ্লোক - ৬।

পুনরায় সখী (রাধাকে) গীতম্ ॥ ১১ ॥

সখি, তোমার জন্য মাধব অভিসারে গমন করছেন, অতএব তুমি আর বিলম্ব কর না, সত্বর মাধবের কাছে যাও। ইত্যাদি। শ্লোক ৮ - ১৫, ১৭ - ২৩।

ভণিতা শ্লোক - ১৬।

ভক্ত বাক্য শ্লোক - ২৬।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠঃ

স্থান - কৃষ্ণের বেতসকুঞ্জ

সময় - পূর্ববৎ

সূত্রধার।

রাধা অভিসারে অক্ষম দেখে সখী গিয়ে গোবিন্দকে বলেছেন, - শ্লোক - ১।

সখী (কৃষ্ণকে) গীতম্ ॥ ১২ ॥

হে মাধব, রাধা উৎসাহ ভরে অভিসারে প্রবৃত্ত হয়ে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই খিন্না বশত: ভূমিতে পতিত হয়েছেন। অভিসারে অক্ষম হয়ে তিনি কুঞ্জে তোমার প্রতীক্ষা করছেন এবং (তোমার সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে) বিলাপ ও রোদন করছেন। ইত্যাদি। শ্লোক - ২ - ৮, ১০ - ১১।

ভণিতা শ্লোক ১১।

ভক্ত বাক্য শ্লোক-১২।

সপ্তম: সর্গ:

নাগর - নারায়ণ:

স্থান - লতাকুঞ্জ

সময় - জ্যোৎস্নালোকিত রজনী

সূত্রধার

আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নাধারা বৃন্দাবনকে আলোকিত করেছে। রাত বয়ে চলল, অথচ মাধব এখনও এলেন না দেখে রাধা বিলাপ ও পরিতাপ করছেন। ইত্যাদি। শ্লোক - ১ - ২।

রাধার বিলাপ। গীতম্ ॥ ১৩ ॥

কথিত সময় পার হয়ে গেল, হরি তবু এলেন না, আমার এই সব সাজ - সজ্জা আমার মনোজ্বালাকেই বর্দ্ধিত করেছে। হরি এলেন না কেন? তিনি কি অন্য

নায়িকার অনুসরণে অভিসারে প্রবৃত্ত হয়েছেন অথবা অন্ধকার বনপথে পথ হারিয়েছেন? ইত্যাদি। শ্লোক ৩ - ৯, ১১।

ভণিতা শ্লোক - ১০।

সূত্রধার

রাধা যখন এসব ভাবছেন তখন মাধবের কাছ থেকে আগতা বিষাদিতা সখীকে দেখে রাধা আশঙ্কা করলেন কৃষ্ণ বুঝি অন্য নায়িকার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। রাধা যেন মানসনেত্রে দেখছেন, শ্লোক - ১২।

রাধা (আত্মগত) গীতম্ ॥ ১৪ ॥

বিষয় - রাধা যেন মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করছেন কৃষ্ণ অন্য কোন নায়িকার সঙ্গে রতিলীলায় মত্ত, সেই ভাগ্যবতী নায়িকা রতিলীলার আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠছেন। ইত্যাদি। শ্লোক ১৩ - ১৯, ২১।

ভণিতা শ্লোক - ২০।

পুনরায় রাধা (আত্মগত) গীতম্ ॥ ১৫ ॥

বিষয় - রাধা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করছেন, যমুনা পুলিনে মুরারি বিহার করছেন। তিনি নায়িকার মুখচুম্বন করছেন, কেশরচনা করছেন। ইত্যাদি।

শ্লোক ২২ - ২৮, ৩০।

ভণিতা শ্লোক ২৯।

রাধা (সখীকে) গীতম্ ॥ ১৬ ॥

সখি, কৃষ্ণ যার সঙ্গে রমণ করছেন, তার অসীম সৌভাগ্য, ইত্যাদি।

ভণিতা শ্লোক ৩৮।

উক্তবাক্য শ্লোক ৪২।

অষ্টমঃ সর্গঃ

বিলক্ষ লক্ষ্মীপতিঃ

স্থান - রাধার লতাগৃহ

সময় - প্রভাত

সূত্রধার

রাধা অতি কষ্টে যামিনী যাপন করলেন। প্রভাতে কৃষ্ণ এসে প্রণত হয়ে রাধাকে অনুনয় করতে লাগলেন। রাধা 'স্মরশর উৎকণ্ঠিতা' হলেও প্রবল অসূয়া বশে কৃষ্ণকে বলছেন, - শ্লোক - ১।

রাধা (কৃষ্ণকে) গীতম্ ॥ ১৭ ॥

গত রজনীতে অন্য রমণীর সঙ্গে রতিলীলার চিহ্নাদি সর্বাঙ্গে ধারণ করে তুমি এসেছ। মাধব তুমি যাও। 'যা বদ কৈতববাদম্' - তুমি আর মিথ্যা কথা বল না। ইত্যাদি। শ্লোক ২ - ৮, ১০।

ভণিতা শ্লোক - ৯।

ভক্তবাক্য শ্লোক - ১০।

নবমঃ সর্গঃ

মুগ্ধ - মুকুন্দঃ

স্থান - কাল = পূর্ববৎ

সূত্রধার

কৃষ্ণ চলে গেলেন কলহান্তরিতা রাধা কৃষ্ণের অনুধ্যানে মগ্ন হলেন। এমন সময় সখী এসে একান্তে তাকে বললেন, শ্লোক - ১।

সখী (রাধাকে) গীতম্ ॥ ১৮ ॥

সখী, তুমি আর মান করে নিজেকে সকলের কাছে উপহাসাস্পদ কর না। যদি অভিসারে এসেছেন, তুমি আর হরিকে প্রত্যাখ্যান করে তোমার যৌবনকে লাঞ্ছিত কর না। ইত্যাদি। শ্লোক ২ - ৮, ১০।

ভণিতা শ্লোক - ৯।

উক্তবাক্য - শ্লোক - ১১।

দশমঃ সর্গঃ

মুগ্ধ-মাধবঃ

স্থান - রাধার লতাকুঞ্জ

সময় - সমাগত সন্ধ্যা।

সূত্রধার

সন্ধ্যা সমাগত, রাধার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলেও এখনও তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে। এমন সময় কৃষ্ণ পুনরায় এসে উপস্থিত হওয়ায় রাধা লজ্জাভাবে সখী-গণের মুখের দিকে চাইছেন। রাধার এই ভাব দেখে কৃষ্ণ সানন্দ বচনে রাধাকে বলছেন, শ্লোক - ১।

কৃষ্ণ (রাধাকে) গীতম্ ॥ ১৯ ॥

বিষয় - কৃষ্ণ রাধাকে নানাবিধ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন, আবার তাঁকে অনুকূলা হতে বলছেন -

"স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।" ইত্যাদি।

শ্লোক - ২ - ৯, ১১ - ১৫।

ভণিতা - শ্লোক - ১০ ।

ভক্ত বাক্য - শ্লোক - ১৭ ।

একাদশঃ সর্গঃ

সানন্দ - গোবিন্দঃ

স্থান - রাধার লতাকুঞ্জ

সময় - প্রদোষ কাল ।

সূত্রধার

অনেকক্ষণ ধরে রাধাকে অনুবাক্যে প্রসন্না করে অন্ধকারপন্থী প্রদোষে কৃষ্ণ কালোচিত বেশবাস ধারণ করে বেতসকুঞ্জে গমন করলেন - অবসাদমুক্তা ও রুচিকর সাজে সজ্জিতা রাধাকে সখী বলতে লাগলেন , শ্লোক - ১ ।

সখী (রাধাকে) গীতম্ ॥ ২০ ॥

সখি , কৃষ্ণ বেতসকুঞ্জে তোমার জন্য অধির আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন , এবার তুমি অভিসার কর । ইত্যাদি । শ্লোক ২ - ৮ , ১০ - ১২ ।

সূত্রধার

বিচিত্র বসন - ভূষণের প্রভায় আলোকিত কুঞ্জ - দ্বারে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে লজ্জিতা রাধাকে সখী বলছেন , শ্লোক - ১৪ ।

সখী (রাধাকে) গীতম্ ॥ ২১ ॥

স্থান - কৃষ্ণের বেতস লতাকুঞ্জ

হে রাধে , মনোহর কুঞ্জতলে কেলিশয্যায় মাধবের নিকট গমন কর ; এবং রতিরসাবেশে বিলাসে প্রবৃত্ত হও । ইত্যাদি । শ্লোক ১৫ - ২০ । ২২ ।

ভণিতা - শ্লোক - ২১ ।

সূত্রধার

সখীর কথা শুনে রাধা গোবিন্দের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে কুঞ্জ গৃহে প্রবেশ করলেন । শ্লোক - ২৩ ।

গীতম্ ॥ ২২ ॥

গানটি সূত্রধারেরই গাওয়া । গানে রাধাকে দেখে কৃষ্ণের আনন্দ , আবেগ পুলকাদির বর্ণনা এবং কৃষ্ণকে দেখে রাধারও হর্ষ - পুলকাদির বর্ণনা আছে । রাধা-কৃষ্ণের এই ভাব দেখে সখীগণ সহাস্যে কুঞ্জগৃহের বাইরে প্রস্থান করলেন ।

শ্লোক ২৪ - ৩০ , ৩২ - ৩৩ ।

ভণিতা শ্লোক - ৩১ ।

ভক্তবাক্য শ্লোক - ৩৪ ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

সুপ্রীত - পীতাম্বরঃ

স্থান - কৃষ্ণের - বেতসকুঞ্জ

সময় - পূর্ববৎ

সূত্রধার

সখীগণ বাইরে গেলে , লজ্জাচিন্তা , মদনাবেগে উৎফুল্লা রাধা নবপল্লব রচিত শয্যার প্রতি বারংবার সলজ্জদৃষ্টিক্ষেপ করছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন,-

শ্লোক - ১ ।

কৃষ্ণ (রাধাকে) । গীতম্ ॥ ২৩ ॥

হে রাধিকে , এই কিশলয় শয্যায় তোমার চরণ স্থাপন কর । তোমার বিকশিত যৌবন দ্বারা আমার মনস্তাপ দূর কর । ইঃ । শ্লোক ঃ ২ - ৮ ।

ভণিতা - শ্লোক - ৯ ।

২৩ নং গীতমের ১০ থেকে ১৩ শ্লোক পর্যন্ত সূত্রধারের গান । এই অংশে রাধা - কৃষ্ণের কুঞ্জলীলার বর্ণনা করা হয়েছে ।

সূত্রধার

সুরতান্তে নিতান্ত খিন্নাঙ্গী রাধা গোবিন্দকে বলছেন , - শ্লোক - ১৫ ।

রাধা (কৃষ্ণকে) গীতম্ ॥ ২৪ ॥

হে যদুনন্দন , তুমি তোমার হাত দিয়ে আমার বিধ্বস্ত বেশবাস , স্খলিত ভূষণাদি , নষ্ট-অলকাবলীসমূহ সব ঠিক-ঠাক করে দাও । ইত্যাদি । শ্লোক ১৭- ২৩,২৫।

ভণিতা শ্লোক - ২৪ ।

সূত্রধার

রাধার কথামত 'প্রীতপীতাম্বর' তাই করলেন । শ্লোক - ২৫ ।

ভক্ত বাক্য - ২৬ - ২৯ ।

কাব্য সমাপ্ত ।

লক্ষণীয় , গীতগোবিন্দের এই নাট্য রূপটির মধ্যে সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য খুবই অল্প । আরম্ভটিও ঠিক সংস্কৃত নাটকের মত নয় । আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল , এই কাব্যের প্রতিটি সর্গের যেমন আলাদা আলাদা নাম আছে , তেমনি প্রতিটি সর্গের শেষেই ভক্তবাক্য আছে । সম্ভবতঃ কাব্যটি একদিনেই শ্রোতব্য ও দর্শনীয় ছিল না , তা না হলে প্রতিটি সর্গের শেষেই ভক্তবাক্য গাওয়ার সার্থকতা থাকে না । যাই হোক , গীতগোবিন্দের এই - সংরচিত নাট্যরূপটির সঙ্গে আমরা পরবর্তী কালের বাংলা এবং বাংলাদেশের আশেপাশে প্রচলিত নাটগীতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করব ।

সূত্র - নির্দেশ।

১। ক) তিন প্রকার দুকূল বা ক্ষৌমবস্ত্রের (লিনেন কাপড়) মধ্যে প্রথম দুপ্রকার—
বাঙ্গক (বঙ্গ দেশে উৎপন্ন) ও পৌণ্ড্রক (উত্তর বঙ্গে উৎপন্ন) (২।১১)।

খ) তিন দেশে উৎপন্ন পত্রোর্ণা বা ধৌত কৌশেয়ের মধ্যে পৌণ্ড্রিকা (পুণ্ড্রদেশজাত) একপ্রকার। (ঐ)

গ) সাতদেশে উৎপন্ন কার্পাস বস্ত্রের মধ্যে বাঙ্গক অন্যতম। (ঐ)।

ঘ) চার প্রকার গুড়ের মধ্যে গৌড়িক (গৌড় দেশে উৎপন্ন) অন্যতম। (২।১৩)।

— অর্থশাস্ত্র।

২। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও গৌড়ের উল্লেখ আছে এভাবে —

'প্রাচাং কটাদেঃ' (৭।৩।২৪) সূত্রে -'পৌণ্ড্রনগরে ভবঃ-পৌণ্ড্রনাগরঃ'।

লুপি যুক্তবদ্ব্যক্তিবচনে (১।২।৫১) সূত্রে -'বঙ্গানাং নিবাসো জনপদঃ-', 'বঙ্গাঃ'।

ন প্রাচ্যভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ (৪।১।১৭৮) সূত্রে - তদ্ধিতান্ত শব্দ- বঙ্গ অর্থে "বাঙ্গী"।

অরিষ্ট গৌড়পূর্বে চ (৬।২।১০০) সূত্রে -'গৌড়পুরম্', 'গৌড়ভৃত্যপুরম্'

এই শব্দগুলি পাওয়া যায়।

৩। দ্রঃ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশঃ দর্শনে ও সাহিত্যে : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

"রাধাতত্ত্বের পূর্ব-প্রাচীন ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব", অধ্যায়। পৃ - ১-১৩।

৪। দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড : পূর্বার্ধ : সুকুমার সেন। পৃ-৭৮।

৫। তদেব। পৃ-৮০।

৬। বাঙালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায়। পৃ - ৩৩৮।

৭। "লক্ষ্যতে নাটিকাপ্যত্র সংকীর্ণান্যনিবৃত্তয়ে।" দশরূপক, ৩।৩৯।

৮। জাহ্নবী চক্রবর্তীকৃত অনুবাদ। 'আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ', পৃ - ১৬০।

৯। তদেব। পৃ- ২৩৬।

১০। দ্রঃ নট-নাট্য-নাটক। পৃ- ১০১।

১১। পদ্যান্তর - ডঃ সুকুমার সেন। দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ। পৃ- ৩৩।

১২। দ্রঃ রাজনীর ইতিহাস, পৃ- ৮১১।

১৩। 'নট-নাট্য-নাটক' পৃ- ৩০ - ৩১ থেকে গৃহীত।

১৪। দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ। পৃ- ৪৩।

১৫। এই সূত্রে এক সঙ্গীতজ্ঞের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:-

"লৌকিক সঙ্গীতের ইভালিউশনের ফলেই রাগসঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু এর নাট্য নাট্যপ্রয়োগকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তৎকালীন প্রতিটি প্রধান রাগই নাট্যের বিভিন্ন অংশে প্রযুক্ত হত। এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এর অর্থ এই যে, সঙ্গীতকে নাটকে আরও অনেকাংশে সাজেস্টিভ করে তোলা হয়েছে। অভিনয় যখন প্রচলিত ছিল তখন হয়ত এটা সম্ভব হত না। এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে এল রস এবং ঋতু কাল অনুসারে সঙ্গীত প্রয়োগের প্রশ্ন। নাটকে তখনকার দিনে আলোক-সম্পাতের এমন সুব্যবস্থা ছিল না, - দর্শককেই আন্দাজ করে নিতে হত কোন ঋতুতে বা কোন সময়ে ঘটনাটি ঘটেছে। রস অবশ্য দৃশ্যবস্তু থেকে প্রত্যক্ষ ভাবেই অনুভব করা যেত। কিন্তু সঙ্গীত পরিচালকগণ এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না - তাঁরা গানে, বাজনায় এই স্থান, কাল,

শাস্ত্রকে যথোপযুক্ত ভাবে নির্দেশ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, ফলে রাগ-সঙ্গীতকে এমনভাবে রচনা করা হতে লাগল যাতে তার মধ্যে একটা ঋতুর ইঙ্গিত ফোটানো যায়। ... নাট্যে বীর, রৌদ্র বা অদ্ভুত রসের অবতারণা যখন ঘটত তখন এই রাগটিই তাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হত। প্রত্যক্ষভাবে নাটকের চাহিদায় রাগ-সঙ্গীতের এবম্বিধ ক্রমবিকাশ না হলে সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে এই রূপ নাট্য সম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ উল্লেখ থাকত না।"

– 'প্রাচীন নাটক ও সঙ্গীত' : শার্ঙ্গদেব। দেশ, ১১ আষাঢ়, ১৩৮৩।

১৬। 'পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) পৃ-৮৯ থেকে গৃহীত।

১৭। দ্রষ্টব্যঃ জাভা ও বলির নৃত্য-গীত : শান্তিদেব ঘোষ।

১৮। দ্রষ্টব্য- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, পা.টী ৪৮ ক, পৃ - ৩৮৩।

১৯। দ্রষ্টব্য- The Sanskrit Drama - pp - 27, 40, 272.

২০। "Hence it follows that the poet had no intention to write a dramatic poem, in no case a proper drama, but his task was to write a book in which popular danceplay with music and tunes served as a model for song, that constitute the nucleus of the book."

History of Indian Literature - vol-iii, p.146

২১। History of Sanskrit Literature (C.U.) p. 667.

২২। ভারতবর্ষ; আশ্বিন, ১৩৩৯। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের সমালোচনা।

২৩। History of Sanskrit Literature. (c.u.) p. 510.

২৪। " The well known Sanskrit Idyll called the Gitagovinda by Jaydeva Goswami, which .... is nothing but a sort of yatra in Sanskrit. " – Yatra – p. 5.

২৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ – পৃ. ৪২।

২৬। দ্রঃ নট-নাট্য-নাটক। পৃ – ৩৩।

২৭। তদেব। পৃ – ৯৭।

২৮। "The break up of the old orthodox drama was almost synchronous with the use of Apabhramsa and modern Indian Literature: and along with it came popular entertainments of the type of semi – religious jatra ..... "

A History of Classical Sanskrit Literature. vol – I, Calcutta – 1962, p. 508.

২৯। পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস : ১ম ভাগ-পৃ – ৬৪।

৩০। History of Sanskrit Literature, S.K.De, p. 570.

৩১। History of Indian Literature, vol – III p. 146.

৩২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড। পৃ – ৩১২।

৩৩। গীতালী সম্পর্কে আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড। পৃ – ৩৩৩।

৩৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, পূর্বার্ধ। পৃ – ৪৭।